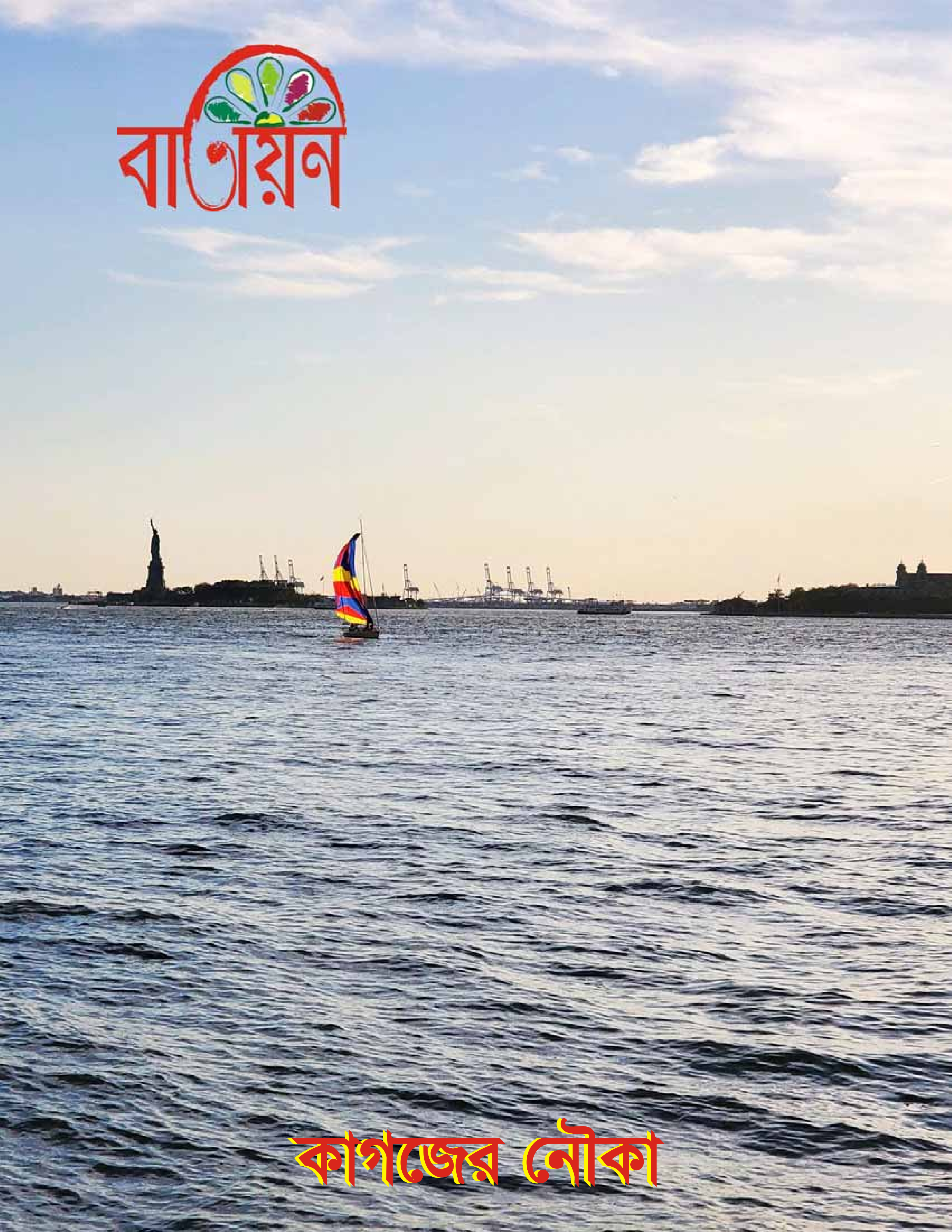
বাতায়ন
কাগজের নৌকা

Partha

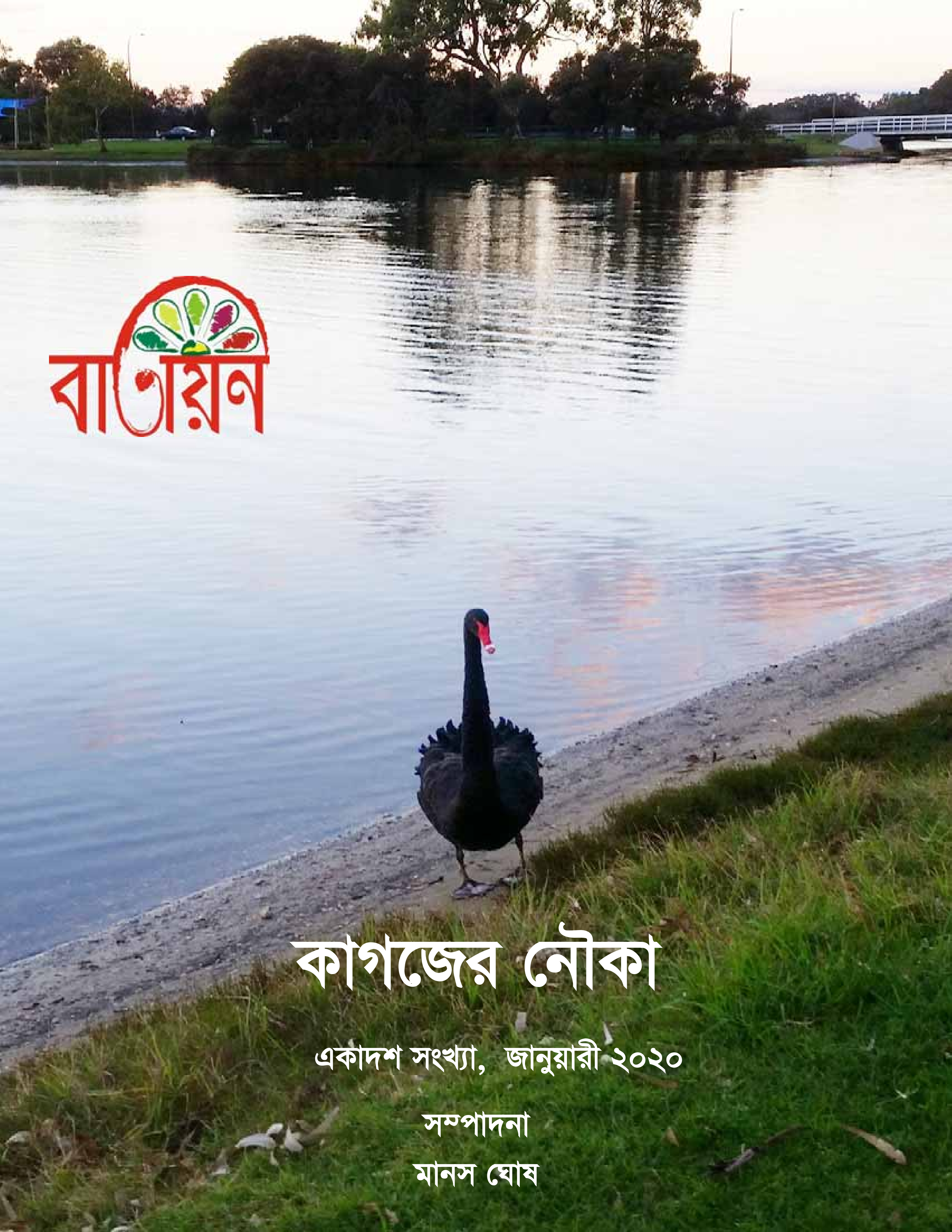

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০২০

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 11 : January 2020

Editors

Manas Ghosh, Kagajer Nauka
Ranjita Chattopadhyay
Jill Charles (English Section)

Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support

Susanta Nandi, India

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production

Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Front Cover : The photo was taken at Battery Park, New York City, USA. The ocean is The Atlantic Ocean.

Saumen Chattopadhyay

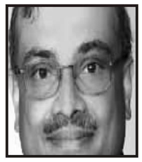

Saumen Chattopadhyay — Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Partha Pratim Ghosh **Banaras : Inside Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Benjamin Ghosh **Inside Back Cover & Illustrations**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে । পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য ।

Krishnakoli Bose Banerjea **Back Cover : St. Kilda – Sun set**

Krishnakoli Bose Banerjea – মেলবর্ন বাসিন্দা... মনে প্রাণে Calcacian. পেশায় Cloud Solution Architect. My analytical left brain is always being challenged by my creative right brain with music, painting, poetry, photography.... yet to find the winner..

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সুধী,

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারী। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এমন একটা ভাষায় কথা বলতে পারার জন্য গর্ব অনুভব করি, যে ভাষার অধিকারের লড়াই থেকে জন্ম হয়েছিল একটি রাষ্ট্রের, আর সেই আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়েই প্রতিবছর পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আজকের দিনে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই অমর একুশের ভাষা শহীদদের, যাঁদের আত্মোৎসর্গ ছাড়া সম্ভব হত না এই উদযাপন।

এবারের সংখ্যাটি প্রকাশ হতে দেরী হওয়ার জন্য পাঠকদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

"অজুহাত দেবনা কোনো, বিলম্বের নিযুত কারন !"

গত ২৭শে জানুয়ারি থেকে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা নিয়ে টিম বাতায়নের যে ব্যস্ততা শুরু হয়েছিল, সবে তার রেশ কেটেছে। তবে বইমেলা উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়া স্টলে (সৌজন্যে কনসাল জেনারেল অ্যান্ড্রু ফোর্ড) মিলনমেলার যে আনন্দ তার রেশ বহুদিন থেকে যাবে আমাদের মনে ! কলকাতা সহ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকরা হাজির হয়েছিলেন বাতায়নের আমন্ত্রণে।

আমার বড় পাওনা, কাগজের নৌকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, এমন অন্তত পাঁচজন সাহিত্যিকের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডার সুযোগ পেলাম।

কাগজের নৌকার পরবর্তী সংখ্যাতেই শেষ হবে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নবকুমার বসুর লেখা ধারাবাহিক উপন্যাস "হটাবাহার"। শেষ হলেই হয়তো বই আকারে প্রকাশিত হবে। তার আগেই মাত্র কয়েকটা ক্লিক করে, গোটা উপন্যাসটি পড়ে ফেলার সুযোগ বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

দেখা হল, রমাদির সঙ্গে, 'চা-ঘর' খ্যাত রমা জোয়ারদার। বললাম আপনার সহজ গদ্য মন ছুঁয়ে যাচ্ছে, রঘু যেন আমাদের ইচ্ছাপূরণের নায়ক।

এই আনন্দ মেলার মধ্যেই একজন এমন একটা প্রশ্ন করলেন, চুপ করে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। প্রশ্নটা হল, – সাহিত্যপত্রিকাগুলিতে যাঁদের লেখা প্রকাশিত হয় তাঁরা নিজেরাও কি পড়ে দেখেন অন্যদের লেখাগুলো? নাকি শুধু নিজের লেখার স্ক্রিনশট নিয়ে, একটা ফেসবুক পোস্টিং করে তারপর পাতা উল্টে রেখে দেন? এর উত্তর আমার জানা নেই। বাতায়নের নিয়মিত লেখক-লেখিকারা কী বলেন?

জগৎ জুড়ে মানুষের পাঠের অভ্যাস কমছে। তার জন্য শুধু পরবর্তী প্রজন্মের ওপর দায় ঠেলে লাভ নেই। এই পঞ্চাশে এসে সভয়ে আবিষ্কার করলাম আমাদের প্রজন্মও অনেকাংশে সাহিত্যপাঠে তার আগ্রহ হারিয়েছে ! বাহ্যিক আড়ম্বর, চটজলদি আনন্দ, ঝাঁ-চকচকে যাপনের চকমেলানো রাজসভায়, সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক চর্চার পরিসর যেন ক্রমশঃ কমে আসছে । এই যেমন, লক্ষ্য করলাম, – বর্ষবরণের উল্লাস আর ব্যস্ততার মাঝে বাতায়ন ও কাগজের নৌকার পাঠকরাও খানিক পিছিয়ে পড়েছেন। ডিসেম্বর সংখ্যাটি নিয়ে এখনও কোনো আলোচনা এসে পৌঁছল না আমার মেইল বক্সে !

অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ দাবানলে ইতিমধ্যে পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। প্রাণহানি হয়েছে লক্ষ লক্ষ পশুপাখির। আমরা শোকস্তব্ধ ! আশা করবো, আগামী দিনগুলোয় বিপদমুক্ত সুনীল আকাশ দেখা যাবে। জঙ্গলে বা লোকালয়ে কোথাও আর গাছে গাছে অথবা মানুষে মানুষে ঘষাঘষি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়বে না !

আজ আসি সবাই ভালো থাকবেন ।

ইতি

মানস ঘোষ
সম্পাদক /কাগজের নৌকা

সূচীপত্র

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	5
তপনজ্যোতি মিত্র	কিছুই চাই না, শুধু	6
সঞ্জয় চক্রবর্তী	কবিতাই বলে কি না	7

গল্প

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	বহিরাগত	46

ধারাবাহিক

নবকুমার বসু	হটাবাহার	17
রমা জোয়ারদার	চা-ঘর	25
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	30

স্মৃতিচারণ

প্রশান্ত চ্যাটার্জী	STC টুর্নামেন্ট – Pass out parade – পোস্টিং	53

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	ঘোড়া	42
পারিজাত ব্যানার্জী	"দুই শালিক"	46

অনুবাদ

উদ্দালক ভরদ্বাজ	বিশ্বকবিতার দরবারে	8
সুজয় দত্ত	প্রতারক	34

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	বেনারসের ডায়রি	58

বই – চেনা

মানস ঘোষ		61

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ২২

কাল বিকেলে কি ভিজেছিলে বৃষ্টিতে ?
অফিসফেরত উঠতে পেরেছো বাসে ?
আমি তো ভেজার উন্মাদ অভিলাষে
পরিব্রাজক রবীন্দ্রসরণিতে
আমি ভিজে গেলে মহানগরের মাথা
ব্যথা নেই, তবে তুমি মহানাগরিকা –
তুমি ভিজলেই ধর্মঘট-বটিকা
গণবয়কট কে সি পালদের ছাতা
আসলে ঠিক সেজন্য উতলা নই
ভিজে সালোয়ারে যদি তুমি যাও হেঁটে
মহানগরের চারদিকে হৈচৈ
কিছু মুর্ছোবে, কিছু বুক যাবে ফেটে
গণহত্যার চাইতে বরং পালি
ঘরে বসে দাও বৃষ্টিতে হাততালি

সনেট ২৩

যামিনী রায়ের ছবির নারীর মতো
বসে থাকে মেয়ে চিবুকের নিচে হাত
আঙুলের ফাঁকে আধফোটা পারিজাত
জানলায় কালবৈশাখি উদ্ধত –
সুন্দরকে কি মাত্রায় গোনা যায় ?
ঝড় বোনা যায় শব্দ-অলঙ্কারে ?
কী করে ফুলের গন্ধকে কারাগারের
দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বাঁধা যাবে সীমানায় ?
প্রকাশিত হোক পারিজাতি অভিসার –
কিন্তু যাতে না বিশালতা যায় কমে
তাই চাই বহুমাত্রিক কবিতার
সব রাস্তাই গিয়ে পৌঁছোক রোমে

গালে চুপ-হাত – স্থির বসে আছে পালি
মূর্তি গড়ছে শ্রী সালভাদর দালি

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্‌সাল্‌টেন্সি কোম্পানির চিফ্‌ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা। গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন।

তপনজ্যোতি মিত্র

কিছুই চাই না, শুধু

আমার কিছুই চাই না, শুধু
কেউ কি আমায় রত্ন দেবে ?
আলোকভরা স্বপ্নকণায়
হাজার পাখির শব্দ হবে

কেমন করে হাজার ছবির
হাজার দীপের আলোর মায়ায়
ঝলসে ওঠা দিনের আলোয়
হাজার গাছের গভীর ছায়ায়

দাঁড়িয়ে থাকা সেই বালকের
ধূসর মাখা স্মৃতি নিয়ে
ডাকবে কি কেউ দূরের মাঠে
স্মৃতির কণা উস্কে দিয়ে ?

স্বপ্নসায়র ? কোথায় তুমি
আলোকমালা জাগিয়ে রাখো ?
আমার কিছুই চাই না, শুধু
করুণ মায়ার আবীর মাখো ।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই.টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু'এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'একটি কান্নার কাহিনী'। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

কবিতাই বলে কি না

কিছু কথা শুধু কথা বলে যায় নিজেদের মতো করে,
বাকি কিছু কথা শুধু একা থাকে কবিতার অক্ষরে।
বিকেল বুনেছে রোদ সোয়েটারে, শহরের বুকে পড়ে,
বাকি এলোমেলো, কলেজ স্ট্রিটের বই খাতা চত্ত্বরে।
পাতা ওল্টাই, প্রকাশিত বই, মলাটের ভাঁজে বন্ধ,
তাতেও পাইনি তোমার বুকের ওডিকোলোনের গন্ধ।
কথা ছিল এক ধূসর বিকেলে দেখা ফের হবে শেষে,
যেথা প্রতিকূল দিন শেষে নদী নীল মোহনায় মেশে।
কথা ছিল সেই ব্যস্ত ক্রসিংয়ে মুখোমুখি হতে পারি,
বিগতের দিন, সরিয়ে সময়, স্রোত বিরুদ্ধচারী।
হাতে হাত রেখে ফিরে আসা যাবে কথা দেয়া ছিলো যত,
কোনো সন্ধ্যায় একা ঘর কোণে ফেরা পাখীদের মতো।
একা সন্ধ্যে, নিওনেতে ভেজে শহরের কোষে কোষে
হয়তো কোথাও লেখা ছিল কোনো পোড়া কপালের দোষে।
তোমার জন্য প্রতিদিন মরি, বলে যেতে পারছিনা,
যা কিছু লিখেছি আজো জানিনা তা কবিতাই বলে কিনা।

সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

বিশ্বকবিতার দরবারে

জারোস্লাভ সিফার্ট

জন্ম ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০১, জিজকভ, প্রাগ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি (অধুনা চেকোস্লোভাকিয়া)

মৃত্যু ঃ ১০ জানুয়ারি, ১৯৮৬, প্রাগ, চেকোস্লোভাকিয়া

নোবেল সাল, প্রাপ্তির সময়ে আবাস ঃ ১৯৮৪, চেকোস্লোভাকিয়া

নোবেল প্রাপ্তির প্রণোদনা ঃ "তাঁর কবিতার অভিনবত্ব, ইন্দ্রিয়সুখাশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রাচুর্য, পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয় অদম্য প্রাণশক্তিপূর্ণ ও বহুমুখী মানবাত্মার এক চিরমুক্ত রূপের সঙ্গে।"

ভাষা ঃ চেক

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ঃ ৩০

প্রথম প্রকাশিত কবিতা ঃ ১৯ বছর বয়েসে

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ Město v slzách (City in Tears, 1920)

শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ Být̕i básníkem (To Be a Poet, 1983)

বিখ্যাত কবিতা ঃ Zhasněte světla (Put Out the Lights, 1938)

জীবিকা ঃ সাংবাদিক, লেখক, সম্পাদক: রভনস্ত (Rovnost), সাতেক (Srsatec), রিফ্লেক্তর (Reflektor), নোভা সিনা (Nova Scena) সম্পাদনা সম্পর্কিত কাজ: পেস্ত্রে ভেতি (Pestré kvety), র‍্যানি নভিনি (Ranní noviny)

কবিতা প্রসঙ্গে জারোস্লাভ ঃ কবিতা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কবিতা বা গান আমাদের সাথে এক পূর্বনির্দিষ্ট ঘনিষ্ঠ কথোপকথনে যুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের ক্লান্ত মনের গভীরতম এবং নিরাপদ আশ্রয়ও কবিতাই। জীবনের অনেক প্রতিকূলতা, যার কোন নামও দিতে কুণ্ঠা আমাদের, তারও উজ্জ্বল উদ্ধার, কবিতার গোপন মর্মস্থল (নোবেল বক্তৃতা ১৯৮৪)।

জীবন, সাহিত্য, জনমানসে কবির স্থান ঃ যদিও চেকোস্লোভাকিয়ার বাইরে কবির পরিচিতি ছিল অল্পই, মূলত অনুবাদের অভাবে, তাঁর দেশের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন বড় প্রিয়, কবি হিসেবে, এবং এক শোষণকারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাক-স্বাধীনতার অন্যতম প্রতিভূ হিসেবেও। সিফার্টের শ্রমজীবী সমাজে কাটানো ছেলেবেলা, কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় সেই সংক্রান্ত লেখালেখির কাজ এবং সম্পাদনা, এবং পরের দিকে সোভিয়েত শাসনের করাল কুটিল ছায়ার বিরুদ্ধেও তাঁর সরব সাংবাদিকতা, সবেরই প্রভাব পড়ে তাঁর কবিতায়। শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির কথা ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রথম দিকের কবিতায়; ১৯২১ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ City in Tears, ১৯২৩-এর সামা লাস্কা (Samá láska, ১৯২৩) এবং ১৯২৫ এর স্বাতেবনি সেসতায় (Svatební cesta) আমরা পাই আশাবাদী ও নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে অর্পিত সিফার্টকে। ১৯২৬ সালে কম্যুনিজম নিয়ে স্বপ্নভঙ্গের পর কবি লিখলেন The Nightingale Sings Badly; এই কবিতাগুলিতে স্পষ্ট প্রভাব অধিবাস্তববাদ এবং

দাদা-ইজমের, যদিও সেই প্রভাব বেশী দিন থাকে নি তাঁর লেখায়। সময়ের সাথে কবির ভাবাদর্শও পরিণত হতে থাকে এবং ক্রমশ সমাজতন্ত্রের সমালোচনায় মুখর হইয়ে উঠতে থাকে কবির লেখনী। ১৯২৯ সালে আরও ছজন কম্যুনিস্ট লেখকের সঙ্গে তিনিও সই করলেন, চেকোস্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির বলশেভিক গতিবিধির বিরুদ্ধে সাক্ষরনামায়। এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস বদলের পরে, কবির কবিতায়ও আমরা দেখতে থাকি বিভিন্ন পটভূমি, বিষয় এবং স্টাইলের আনাগোনা। প্রচার ও আদর্শবাদ থেকে সরে ক্রমশ কবির প্রবেশ দেখি জীবনের অন্যান্য বিষয়ে, প্রেমেও। জাব্লকো জ ক্লিনা (Jablko z klína, ১৯৩৩) কাব্যগ্রন্থের কবিতায়, পরিভাষা থেকে নানা শব্দ উঠে এলো, প্রকৃতির নানা ছবির সাথে মিলেমিশে তৈরি করল এক নতুন রীতি। অজস্র কবিতার বিষয় হিসেবে পাওয়া গেল ভালবাসা, এই বইয়ে এবং পরবর্তী বই রুসে ভেনুসিনি (Ruce Venušiny, ১৯৩৬)-তেও। সামগ্রিক দৃষ্টিতে সিফার্টের কবিতার মূলত তিনটি বিষয়, নারীর রূপ, শিল্প ও তাঁর স্বদেশ ভাবনা। কখনো কখনো একই কবিতায় এই তিন বিষয়ই কবি ছুঁয়ে গেছেন, এমনও দেখা যায়। তবে যেই শিহরিত পুলকে কবি নারীপ্রেম ও নারীবন্দনায় রত থেকেছেন সারা জীবন তা একান্তই বিরল এবং অসম্ভব আকর্ষকও বটে। সেসব কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য কবির দায়বদ্ধতা খুব স্পষ্ট ভাবেই ছিল শিল্পের প্রতি, রাজনীতির সেখানে খুব জায়গা হত না।

১৯৩৬, ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ তে কবি ভূষিত হন রাষ্ট্রীয় সম্মানে। ১৯৬৭ সালে কবিকে চিহ্নিত করা হয় রাষ্ট্রীয় শিল্পী হিসেবে। ১৯৮১ সালে সিফার্টের আত্মজীবনী সেকি ক্রাসি স্বেটা (Všecky krásy světa , All the Beauty of the World) আন্তর্দেশীয় স্তরে প্রকাশিত হওয়ার পরে পরেই সিফার্ট মনোনীত হলেন নোবেলের জন্যে। এই গ্রন্থে সিফার্ট, দুই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায়, এবং নাৎসি অবরোধের প্রেক্ষাপটে, চেক আভান্ত-গারদে আন্দোলনের হুবহু নকশা আঁকলেন। ১৯৭৯ সালের Deštník z Picadilly (An Umbrella from Piccadilly) গ্রন্থের 'Finger Prints' কবিতায় কবি লিখলেন, "হয়ত করেছি কোনও পাপ মানুষের কাছে / জানি না! / আইন বুঝি না আমি। / তবু শাস্তি পেয়েছি যাবজ্জীবনের।/ ভালবাসা যদি হয় অজস্র আয়নায় ভরা গোলকধাঁধাঁ, জানি আমি ঠিক তাই সে, / কবেই পেরিয়েছি তার সীমার কাঁটাতার আমি, এসেছি সজ্ঞানে তার মোহের পেলবে / সেই থেকে ঘুরে মরি, বেরোবার রাস্তাও জানি নি আর"। ১৯৮৬ সালের ১০ই জানুয়ারি মৃত্যু হয় সিফার্টের। রাষ্ট্রীয় শিল্পী হিসেবে যথোচিত মর্যাদায় পালিত হয় তার অন্তিম সংস্কার।

ট্রিভিয়া ঃ ১৯৮৪ সালে যখন নোবেল পুরস্কারের সম্মান ঘোষিত হয়, সিফার্টের শরীর তখন বেশ খারাপ এবং নিজের হাতে পুরস্কার গ্রহণে তিনি অক্ষম। তাঁর মেয়ে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় স্তরে, প্রথম চেক কবি হিসেবে সিফার্টের নোবেল পুরস্কার পাওয়া একটি বিশেষ ঘটনা, অথচ সে সময়ে চেকদেশীয় প্রচার মাধ্যমগুলি খুব একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নি। লৌহ-পর্দার অপসারণের বাদেই দেশের মানুষ অবহিত হয়েছিলেন তাদের মাঝের এই বিরল শিল্প প্রতিভার সম্বন্ধে। সিফার্ট নিজে যদিও তাঁর স্বদেশের, সোভিয়েত কবল থেকে মুক্তি দেখে যেতে পারেন নি। বরং ১৯৮৬ সালে, ক্রালুপিতে তাঁর অন্তিম সংস্কারের সময়ে অগুন্তি সাদা পোশাকের পুলিশের অবস্থিতি ছিল দেখার মত। শবানুগামীদের তরফে কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ রোধ করতে ছিল সরকারের সব টুকু প্রচেষ্টা।

অনুদিত কবিতাগুলি নিয়ে কিছু কথা ঃ ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত সিফার্টের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের সঙ্কলন অহ Umbrella from Picadillyi সমালোচনা করতে গিয়ে মাইকেল হেনরি লিখছেন "এক অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীল জীবনের পড়ন্ত বিকেলের আভা এই কবিতাগুলির শরীরে ছড়ানো। এক নিঃশর্ত আনুগত্য, অন্তরঙ্গ ভাষার প্রতি, নারীর প্রতি (এবং এই অনুরাগ নারীকে শুধু এক সর্বাঙ্গ সুন্দর সৃষ্টি রূপে নয়, সমগ্র মানবতার প্রতীক হিসেবে দেখায়) এই কবির কবিতার প্রত্যেক ছত্রে ছড়ানো"। অনুবাদ করতে গিয়ে আমিও বেছে নিয়েছি সেই সব কবিতা, যা কবির এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথাই বলে। 'কবির জীবন' কবিতায় কবি তাঁর কবিতা ও জীবনের এই সারমর্মের কথাই তুলে ধরেন। কবিতার ভাষা যেন ছবি এঁকে দেয় পাঠকের মনে, কবিমনের, কবিজীবনের। 'পিকাডেলির ছাতা' কবিতায় কবি রসিক প্রেমিক। বয়েসের ভারে ন্যুব্জ কবি, কিন্তু সৌন্দর্য এখনো হাতছানি দিয়ে যায় তাকে। তবু সেই রূপের কাছে গিয়ে সেই অনুরাগ ব্যক্ত করার সময় বা সুযোগ এখন আর নেই। তাই সেই ইচ্ছাকে এড়িয়ে যেতে কবি বৃষ্টি এবং ছাতার অনুষঙ্গে এক অদ্ভুত কমেডির সৃষ্টি করেন

যা একই সঙ্গে মনে এনে দেয় বেদনা এবং সহজ সরল হাসির উচ্ছাসও। 'ছেঁড়া চিঠি' কবিতায়, ফুরিয়ে আসা জীবনের পারে দাঁড়িয়ে এক প্রেমিক কবির ফিরে দেখা এবং সহজ স্বীকারোক্তি; নারীর শরীর নিয়ে মুগ্ধতা এবং নারীকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না তাঁর। জীবনের একমাত্র উপজীব্য কি তাহলে শুধু এই প্রেম ? এখনো, মুহূর্তের আবেশেও সেই প্রাঞ্জল কামনার এক টুকরো স্বাদ পেতে আগ্রহী কবি, কারণ জীবন শেষের পারে যে শুধুই আঁধার। নশ্বর নিখিল-মানবমনের এই করুণ আর্তি ঝরে ঝরে পড়েছে এই কবিতার প্রত্যেক ছত্রে। শেষ কবিতা 'এবার বিদায় দাও'-এ কবি তাঁর নিজের জীবনের সমাযোগ করছেন এক অপূর্ব আবেগে, সেখানে অহংকার নেই সার্থক সৃষ্টির, নেই আকাঙ্ক্ষা চিরন্তনতা অর্জনেরও। এই কবিতার কবি খুব স্পষ্ট অনুভবে জানেন, মানব মনের সমস্ত আর্তি এবং তার উচ্চারণ, সে যতই শ্লাঘ্য হোক না কেন, মননে এবং প্রকাশের আলোয়, তবু তার দাম, কনামাত্র নেই এই নিখিল সৃষ্টির নিরিখে। ঝিঁঝিঁর করুণ কান্নার চেয়ে সিকিভাগ বেশীও নয় তার মিলিত প্রজ্ঞা। তবু এই বিপুল সৃষ্টির তরঙ্গে কবি কেঁপে উঠে যে ভাষা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই চিরন্তন ভাষা শুধু জানে প্রেমিক প্রেমিকা; তাদের স্বপ্নিল চোখে, ঠোঁটে জাগে সেই ভাষা, সৃষ্টির আদিম উন্মাদনা। সে ভাষাই কবিতা তো, তাকেই তো ছুঁতে চেয়েছেন কবি জীবনের প্রত্যেক চর্যায়। সে চাওয়ায় ভুল নেই কোন, ত্রুটি হতে পারে না কোন। কারণ সৃষ্টিই এক মাত্র সত্য আর ভালবাসাই তার মন্ত্র, আর কিছু নেই, কোথাও, কোনখানে।

সুত্রপঞ্জিঃ

1. My Poetic Side Bio: https://mypoeticside.com/poets/jaroslav-seifert-poems
2. Nobel.org life sketch: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1984/seifert/facts/
3. Authorscalender Bio: http://authorscalendar.info/jseifert.htm
4. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert
5. Poetry foundation: https://www.poetryfoundation.org/poets/jaroslav-seifert
6. New Yorker article after Siefert's death: https://www.nytimes.com/1986/01/11/obituaries/jaroslav-seifert-czech-poet-is-dead.html

কবির জীবন

জীবন আমাকে অনেক আগেই
শিখিয়ে দিয়েছে –
কবিতা, গান, জীবনের
সব চেয়ে মধুর পাওয়া সব,
হৃদয়ে আশ্বাস আনে,
স্নিগ্ধতায় ঢেকে দেয় আমাদের।
প্রেমের কথা আলাদা অবশ্য।

সে বছরই ভার্কলিকের মৃত্যু
হয়েছিল, মনে আছে।
আমি ইম্পিরিয়াল প্রিন্টিং প্রেসের
"কবিতার তত্ত্ব" বইয়ে কাব্য ও উপমা
অংশ গুলে খেলাম।

কাঁচের গ্লাসে গোলাপ সাজিয়ে,
মোমবাতি জ্বালিয়ে শুরু হল
আমার প্রথম কাব্যচর্চা।
"জাগো, আমার আগুন-পাখি শব্দ,
ওড়ো!, ঝাঁপিয়ে পড়ো লেলিহান শিখায়,
আমার খাতার পাতার ব্যর্থ অন্ধকারে।
তাতে যদি আঙুল পোড়ে, পুড়ুক।"

অব্যর্থ উপমার মূল্য নাকি
আঙুলে আংটি পরানোর চেয়ে
ঢের দামি ! যত্ত সব!
পাকমাজারের ছন্দ অভিধানেও
কিছুই লাভ হল না।
অনর্থক চেষ্টায় শুধু খুঁজেই গেলাম
প্রথম লাইনের প্রেরণা;

অসম্ভব মরিয়া, শেষমেশ
চোখ বন্ধ করে ভাবতে বসলাম।
অথচ, নিশ্চুপ সেই অন্ধকার মগ্নতায়,
শব্দ নয়, স্পষ্ট দেখলাম
নারীমুখ এক। বিচ্ছুরিত হাসি,
হাওয়ায় ওড়া চুল,
নির্ভুল, মধুর ...

এই আমার নিয়তি ...
সারা জীবন, ইথার তরঙ্গের মত,
রুদ্ধশ্বাস, মন্ত্রমুগ্ধ উল্কার বেগে
উড়ে চলি, বার বার,
শুধু সেই স্বর্ণিল ভবিতব্যের দিকে।
আর কোনও গতি
জানি নি কোনদিন
জানবও না বোধ হয়।

To Be a Poet

Life taught me long ago
that music and poetry
are the most beautiful things on earth
that life can give us.
Except for love, of course.

In an old textbook
published by the Imperial Printing House
in the year of Vrchlický's death
I looked up the section on poetics
and poetic ornament.

Then I placed a rose in a tumbler,
lit a candle
and started to write my first verses.
Flare up, flame of words,
and soar,
even if my fingers get burned!

A startling metaphor is worth more
than a ring on one's finger.
But not even Puchmajer's Rhyming Dictionary
was any use to me.
In vain I snatched for ideas
and fiercely closed my eyes
in order to hear that first magic line.

But in the dark, instead of words,
I saw a woman's smile and
wind-blown hair.

That has been my destiny.
And I've been staggering towards it breathlessly
all my life.

পিকাডেলির ছাতা

তুমি যদি ভালবাসায় জেরবার হয়ে গিয়ে থাক,
তাহলে আর এক বার প্রেমে পড়ে যাও ।
কার সাথে ?
এই ধর ইংল্যান্ডের রানীর।
কেনই বা নয় ?
তার মুখশ্রী তো, সে বর্ষীয়ান দেশের
সমস্ত পোস্টেজ স্ট্যাম্পে ছড়ানো,
অসুবিধাটা কই ?
তবেঁ হ্যাঁ, যদি তুমি তার সাথে
হাইড পার্কে ঘুরতে যেতে চাও –
তাহলে মুশকিল,
তোমার অপেক্ষা যে অন্তহীন হবে
তা প্রায় নিশ্চিত ।

যদি বিন্দুমাত্রও সুবুদ্ধি থেকে থাকে
তাহলে তুমি নিজেকে বোঝাবে –
"আরে, যাওয়া তো যায়ই ঘুরতে,
সে আর অসুবিধা কই ?
কিন্তু মুশকিল হল
হাইড পার্কে যে বৃষ্টি পড়ছে এখন
নাহলে তো ..."

আমার ছেলে সেবার
লন্ডনের পিকাডেলি থেকে
ভারি সুন্দর, একটা
ছাতা কিনে দিয়েছে আমায় ।
আমার মাথার ওপর তাই এখন
আমার নিজস্ব একটা ছোট আকাশ থাকে ।
হয়তো কালো, কিন্তু টান টান,
তার ধাতব স্পোক-গুলো বেয়ে
যে কোন মুহূর্তে বিদ্যুতের মত,
নেমে আসতে পারে
ঈশ্বরের পরম করুণা ।

আমি তাই ছাতা মেলে ধরি
এমন কি যখন বৃষ্টি হচ্ছে না, তখনো,
সামিয়ানার মত ।
শেক্সপিয়ারের সনেটের বইটা,
যেটা আমি সর্বদা পকেটে রেখে
ঘুরে বেড়াই –
তার ওপরেও ধরি ।

তবু মাঝে মাঝে
এই ঝকঝকে ফুলের তোড়া,
এই আকাশী চাঁদোয়া –
আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়।
সমস্ত সৌন্দর্য ছাপিয়ে আতঙ্কে নীল হই
ওর অন্তহীন অসীমতার আভাসে,
ঠিক যেন মৃত্যু, অন্তিম শয়ন।

ভয় দেখায় আদিগন্ত ব্যাপী
ওর হিমশীতল শূন্যতাও।
অযুত আলোকবর্ষ ছড়ানো
কোটি তারার কুহেলি
আমাকে জাগিয়ে রাখে,
তাদের অশরীরী বিচ্ছুরণের
মোহ-আবেশে।

এর মধ্যে যেটির নাম "ভেনাস"
তিনি তো সব চেয়ে মারাত্মক।
তার তো সমস্ত পাথর শিলাই
ফুটন্ত এখনো ।
দানবাকার ঢেউয়ের পাহাড়
সেখানে, প্রতি দিন উঠছে, নামছে ।
আর জ্বলন্ত গন্ধক, ধোঁয়া ওঠা –
গলে পড়ছে ঝরনার মত;
নরক যদি থেকে থাকে কোথাও
সে সেখানেই।

একটি নশ্বর ছাতা
কিই বা করতে পারে
এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোপের মুখে !
তা ছাড়া, আমি আর
সঙ্গে রাখি না তাকে।
এমনিতেই অনেক কাজ বাপু,
হেঁটে যাওয়া, পায়ে পায়ে;

মাটির ওপর সটান দাঁড়িয়ে,
মাটির কাছাকাছি থেকে -
দিনের আলোয়, রাত্রির মথের মত
গাছের বাকলের
কর্কশ স্থিরতার দিকে।

সারাজীবন সেই স্বর্গ খুঁজেছি আমি,
ছিল যা এখানেই। যার ভগ্নরেখ,
যৎকিঞ্চিত পরিচয় আমি পেয়েছি
শুধু নারীর অধরে ।
এবং তার অব্যর্থ শরীরের বাঁকে
নির্ভুল কানাচে, যখনই জেগেছে সেও
উষ্ণ প্রেমে, গ্রন্থিল সিঁথিতে ...

সারা জীবন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কাটিয়ে
অবশেষে পেয়েছি সেই অলখ দরজা
অযাচিত স্বর্গের তোরণ –
মৃত্যু তার নাম ।

এখন, যখন শিথিল শোণিত,
বুড়ো হাড়ে নেই কোন সুঠাম বিশ্বাস,
এখনো, কখনো চকিতে,
কোন নারীমুখ
তীক্ষ্ণ বাতাসের মত
যখন ছুঁয়ে যায় দুচোখ,
তার চঞ্চল হাসি,
জাগায় উন্মন ঘূর্ণি
আমার ক্লান্ত রক্তের নদী-বুকে –

সলাজ সম্ভ্রমে আমি, ঘুরিয়ে নিই দৃষ্টি,
আর মনে করি ইংল্যান্ডের রাণীকে;
যার মুখশ্রী কিনা, সে বর্ষীয়ান দেশের
সমস্ত পোস্টেজ স্ট্যাম্পে ছড়ানো ।
ঈশ্বর রাণীকে দীর্ঘায়ু করুন !

আর হ্যাঁ, আমি ভালো করেই জানি
আজ হাইড পার্কে তুমুল বৃষ্টি,

An Umbrella from Piccadilly

If you're at your wits' end concerning love
try falling in love again
say, with the Queen of England.
Why not!
Her features are on every postage stamp
of that ancient kingdom.
But if you were to ask her
for a date in Hyde Park
you can bet that
you'd wait in vain.

If you've any sense at all
you'll wisely tell yourself:
Why of course, I know:
it's raining in Hyde Park today.

When he was in England
my son bought me in London's Piccadilly
an elegant umbrella.
Whenever necessary
I now have above my head
my own small sky
which may be black
but in its tensioned wire spokes
God's mercy may be flowing like
an electric current.

I open my umbrella even when it's not raining,
as a canopy
over the volume of Shakespeare's sonnets
I carry with me in my pocket.

But there are moments when I am frightened
even by the sparkling bouquet of the universe.
Outstripping its beauty
it threatens us with its infinity
and that is all too similar
to the sleep of death.
It also threatens us with the void and frostiness
of its thousands of stars
which at night delude us
with their gleam.

The one we have named Venus
is downright terrifying.
Its rocks are still on the boil
and like gigantic waves
mountains are rising up
and burning sulphur falls.

We always ask where hell is.
It is there!

But what use is a fragile umbrella
against the universe?
Besides, I don't even carry it.
I have enough of a job
to walk along
clinging close to the ground
as a nocturnal moth in daytime
to the coarse bark of a tree.

All my life I have sought the paradise
that used to be here,
whose traces I have found
only on women's lips
and in the curves of their skin
when it is warm with love.

All my life I have longed
for freedom.
At last I've discovered the door
that leads to it.
It is death.

Now that I'm old
some charming woman's face
will sometimes waft between my lashes
and her smile will stir my blood.

Shyly I turn my head
and remember the Queen of England,
whose features are on every postage stamp
of that ancient kingdom.
God save the Queen!

Oh yes, I know quite well:
it's raining in Hyde Park today.

ছেঁড়া চিঠি

কাল সারা রাত
অঝোর-ধার বৃষ্টি আছড়ে
পড়েছে জানলার কাঁচে,
ঘুমোতে পারি নি আমি।
শেষমেশ, আলো জ্বালিয়ে
চিঠি লিখতে বসলাম ।

ভালবাসা যদি উড়তে পারত !
পারে না যদিও, তবু যদি মাটি কামড়ে
পড়ে থাকার অভ্যেস ছেড়ে দিয়ে
উড্ডীন হত আকাশপারের খেয়ায়,

বেশ হত কিন্তু সেই হাওয়ায়
ভেসে থাকতে পারলে !

মত্ত মৌমাছির মত
ঝাঁকে ঝাঁকে, চুমু নেমে আসে;
মেয়েলি শরীরের মধু, কানাচে কানাচে
ঈর্ষায়, তাপে, উদ্বৃত্ত আবেগে।
এলোপাথাড়ি, অধৈর্য হাত
আঁকড়ে আঁকড়ে ধরে
যা কিছু পাথেয়,
তার শরীরী সড়কে ।

থামে না প্রমত্ত কামনা;
মৃত্যুও যন্ত্রনাহীন বোধ হয়
সেই চির উচ্ছ্বল উল্লাস –
মুহূর্তের আঙ্গিনায় ।

কে কবে রেখেছে হিসেব –
কতখানি ভালবাসা, জমে থাকে
উদ্যত প্রেমের দু হাতে !

প্রেমিকার চিঠি পাঠাতে তাই, সর্বদা,
আমি পায়রা ব্যবহারেই বিশ্বাস করি।
চিল বা বাজকে এই কাজে লাগান অসমীচীন ।

আমার কলমের নীচে
নাচে না এখন আর কবিতার লতার শরীর;
আর চোখের কোণে আটকে থাকা –
এক ফোঁটা অশ্রুর মত
পৃথিবী দুলছে
সময়ের অনন্য কিনারায়।
আর আমার গোটা জীবনটা
যেন আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র,
দ্রুতগামী ট্রেনের কামরায়।

চলন্ত গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আমি।
প্রতি দিন ছিটকে যাচ্ছি
দুঃখের কুয়াশায় মোড়া অতীত রাস্তায়।
এক এক সময়ে পাগলের মত
খুঁজে চলছি এমারজেন্সি ব্রেকের হাতল ।

হয়তো এক বার, ভেসে উঠবে জানলায় –
আরও এক ষোড়শীর হাসি,
ছেঁড়া ফুলের পাপড়ির মত
আটকে থাকা, তার চোখের পাতায় –
হয়তো আরও এক বার সম্মতি পাব,
শেষ চুমু,
ছুঁয়ে ফেলা,
পাপড়ির নরম,
অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার আগে !

হয়তো আরও এক বার
কারও নিভাঁজ গোড়ালি –
মসৃণ পাথর ছেনে,
ছড়াবে রত্নের আভা।
আর, আরও এক বার
দম আটকানো কামনায়
নিঃশ্বাস বন্ধ করে –
আরও এক বার
বেঁচে নেব আমি ।

এক জন মানুষ, কতটা সঞ্চয়
ক্রমাগত ফেলে ফেলে যেতে পারে, বল তো ?
বিস্মৃতি স্টেশন পৌঁছনোর আর কত দূর ?
সেখানে তো ছড়িয়ে আছে
মাইল মাইল বিস্তৃত মন্দার বন;
যার মদির গন্ধ, ভুলিয়ে দেবে সব টুকু
এই প্রেম, নশ্বর কামনা, কাদা, সেও ।

সেই শেষ স্টপ তো,
আর কোথাও যাবার নেই যে ...

Fragment of a Letter

All night rain lashed the windows.
I couldn't go to sleep.
So I switched on the light
and wrote a letter.

If love could fly,
as of course it can't,
and didn't so often stay close to the ground,
it would be delightful to be enveloped
in its breeze.

But like infuriated bees
jealous kisses swarm down upon
the sweetness of the female body
and an impatient hand grasps
whatever it can reach,
and desire does not flag.
Even death might be without terror
at the moment of exultation.

But who has ever calculated
how much love goes
into one pair of open arms!

Letters to women
I always sent by pigeon post.
My conscience is clear.
I never entrusted them to
Sparrowhawks or goshawks.

Under my pen the verses dance no longer
and like a tear in the corner of an eye
the word hangs back.
And all my life, at its end,
is now only a fast journey on a train:

I'm standing by the window of the carriage
and day after day
speeds back into yesterday
to join the black mists of sorrow.
At times I helplessly catch hold
of the emergency brake.

Perhaps I shall once more catch sight
of a woman's smile,
trapped like a torn-off flower
on the lashes of her eyes.
Perhaps I may still be allowed
to send those eyes at least one kiss
before they're lost to me in the dark.

Perhaps once more I shall even see
a slender ankle
chiseled like a gem
out of warm tenderness,
so that I might once more
half choke with longing.

How much is there that man must leave behind
as the train inexorably approaches
Lethe Station
with its plantations of shimmering asphodels
amidst whose perfume everything is forgotten.
Including human love.

That is the final stop:
the train goes no further.

এবার বিদায় দাও

সেই সব অজস্র পঙক্তি পৃথিবীর
আমিও জুড়েছি কয়েকটি আরও।
ঝিঁঝিঁর একটানা কান্নার চেয়ে
বেশী প্রাজ্ঞ নয়, তেমন কিছু
বলারও ছিল না, জানি;
ক্ষমা করো আমায়,
দিনও ফুরিয়ে এলো এবারের মত।

চাঁদের মাটিতে প্রথম পদচিহ্নের
মত ছিল না সে সব শব্দ,
যদি কখনো নিঃশব্দ বিচ্ছুরণে
ছুঁয়ে থাকে তোমায় –
সে আলো ওদের ছিল না
ধার করা মায়া সব।

সেই ভাষা ভালো লেগেছিল তবু।
যে ভাষায় স্তব্ধ ঠোঁট
কেঁপে ওঠে নির্জন আবেশে,
প্রমত্ত চুমুতে মাতে তরুণ যুগল,
স্বর্ণীল সন্ধ্যায় হেঁটে যায় যখন ওরা –
স্বপ্নের দুরন্ত ইশারায়,
রোদে-রাঙ্গা ফসলের ক্ষেত পেরিয়ে ...

কবিতা তো আমাদের সাথে
সেই প্রথম দিনের থেকে।
প্রেম, ক্ষুধা, মহামারী, যুদ্ধের মতই
মর্মন্তুদ, নিবিষ্ট গহনে,
জীবনের মাঝে, জীবন হয়েই তো।

কখনো আমার শব্দ, জানি আমি
ঝরেছে মূঢ়তায়, কিন্তু তারও
দেব না কৈফিয়ত কোন।
কেন না আমি এখনো বিশ্বাস করি,
মনোলোভা শব্দের চয়ন,
ঢের ভালো, হত্যা, ধ্বংস, নিধনের চেয়ে।

And Now Goodbye

To all those million verses in the world
I've added just a few.
They probably were no wiser than a cricket's chirrup.
I know. Forgive me.
I'm coming to the end.

They weren't even the first footmarks
in the lunar dust.
If at times they sparkled after all
it was not their light.
I loved this language.

And that which forces silent lips
to quiver
will make young lovers kiss
as they stroll through red-gilded fields
under a sunset
slower than in the tropics.

Poetry is with us from the start.
Like loving,
like hunger, like the plague, like war.
At times my verses were embarrassingly
foolish.

But I make no excuse.
I believe that seeking beautiful words
is better
than killing and murdering.

নবকুমার বসু

পর্ব ১১

হটাবাহার

(১৭)

রজতাভর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটা যে এমন নিঃসাড়ে এসে চলে যাবে, সুদীপা ভাবতেও পারেন নি।

কয়েকদিন ধরে ঘুরেঘুরে মনে পড়ছিল ঠিকই, কিন্তু আর কিছু তো করতে পারলেন না ! আসলে বেশি করে মনে পড়ছিল মৃত্যুর পাঁচদিন আগের কথা — যেদিন আকস্মিক প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল জলজ্যান্ত লোকটা। কয়েক মুহূর্ত দিশাহারা ভাব হলেও দ্রুত সচেতন হয়েছিলেন সুদীপা . . . কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল এ্যাম্বুলেন্স . . . । কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গিয়েছিল পরের দিনগুলো . . . যেন নানান অস্থায়ী ভাবনার দোলাচলে ভাসছিলেন। তারপর একদিন সব কৃত্রিম লাইফ সাপোর্ট গুলো ডাক্তাররা বন্ধ করে দিলেন, কেননা রজতের সব ভাইটাল অরগ্যানই ফেল করে গিয়েছিল। নিজের চোখের সামনে সবই দেখেছিলেন সুদীপা। কোনও অভিযোগের প্রশ্নও ওঠে না। একটি দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেল রজতাভর মৃত্যুকে চিহ্নিত করে। এখন সুদীপা বুঝতে পারেন, তাঁর আসল দিশাহারা অনুভূতিটা শুরু হয়েছিল, রজতাভর মৃত্যুর কয়েক দিন পর থেকে। সেপ্টেম্বর মাসের সেই দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন ইংল্যান্ডের আকাশে-বাতাশে আসন্ন শরতের ছোঁয়া, গাছের পাতায় রঙের ছোপ ধরেছে, সুদীপা একটু একটু করে টের পেতে শুরু করেছিলেন, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়া কাকে বলে। নিঃসঙ্গতা কি মর্মান্তিক . . . একাকিত্ব কি দুর্বিসহ . . . ঘরের নৈঃশব্দ্য কি পাথরের মতো ভারি . . . । অথচ সময় বয়ে চলেছিল তারমধ্যেই নিজস্ব নিয়মে . . . ।

আবার সেই বিশেষ সময়কে নিয়মের সামাজিকতায় চিহ্নিত করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন সুনন্দনরা। স্থানীয় স্বামী নারায়ণ মন্দিরে রজতাভর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল গতবছর এই সময়ে। সবই মনে পড়ছিল সুদীপার। একইসঙ্গে মনের মধ্যে ওড়াউড়ি করছিল একখন্ড তুলনামূলক ভাবনার মেঘ। কী আর কতখানি পরিবর্তন ঘটেছে এই একবছরে ! সত্যি . . . যেন ভাবাই যায় না, কী দুরন্ত বাঁক নিল জীবন ! ভাবনাচিন্তা-অভিজ্ঞতা . . . অন্য কত-জনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও চেনা জানা . . . চেনা মানুষদের ও নতুন করে চেনা। নতুন করে . . . যেন আবিষ্কার-ই করা নিজের দেশকে। দেশের মানুষ-আত্মীয়-বন্ধু-সামাজিকতাকেও। আবার সাগর পারের প্রবাস ভূমিকেও কি নতুন চোখে দেখা হল না !

রজতাভর মৃত্যুর দিনটা চলেই গেছে।

মাইতি মনে রেখেছিল ! রাখতেই হয়েছিল। কেননা সুদীপার নিস্পৃহ নৈঃশব্দ্যকে অতিক্রম করার দরকার ছিল ওর। গতমাস থেকে দিদি প্রায় যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন মাইতির সঙ্গে . . . একটা উপলক্ষ্য নিয়ে আবার কাছের মানুষের মতো ওর হাজির হওয়ার দরকার ছিল এ বাড়িতে। দরকার ছিল সুদীপার ভাবগতিক — প্ল্যান এবং অবস্থান জানার। সুযোগসন্ধানীরা তাই করে।

রজতদার মৃত্যুবার্ষিকী তো এসে পড়ল . . . বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করতে হবে না দিদি !

সুদীপা জানতেন মাইতি এসেছে। প্রীতিলতা খবর দিয়েছিলেন। টেলিফোনে কথা সেরে ইচ্ছে করেই দেরি করে এসেছিলেন মাইতির সামনে।

বললেন, এখানে আর ওসব করার ইচ্ছে নেই।

না-না তা বলছেন কেন ! একটা বাৎসরিক কাজ করাই উচিত।

ওদেশে থাকলে হয়তো কিছু করা যেত . . . এখানে ছেলেমেয়েও নেই . . . ।

তাইতে কি . . . আমরা তো আছি . . . রূপাদিরা আছেন . . . মাসিমা রয়েছেন . . . ।

জামাইয়ের শ্রাদ্ধ দেখা মা-র কাছে খুব ভাল অনুষ্ঠান নয় মাইতি ।

আহা-হা . . . না-না, সে তো বটেই . . . তাহলেও প্রথমবার্ষিক শ্রাদ্ধ তো করতেই হয় দিদি . . . ।

আমি ঠিক সেরকম মানসিক অবস্থাতেও নাই মাইতি . . . ।

মাইতি একটু আন্তরিক ভাব দেখিয়ে বলল, সে আর আমাকে কী বলবেন . . . জানি তো . . . ! তবে এই বাৎসরিক কাজের ভারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন ।

তোমার ওপর তো আরও অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছিলাম । কী যে দাঁড়ায় শেষপর্যন্ত . . . এ বিষয়ে . . . ।

সেসব এখন বাদ দিন দীপাদি . . . মাঝেমধ্যে ছোটখাট মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো হয়ই . . . ।

কিন্তু আমায় না-জানিয়ে অপু-সোনাদিদের সঙ্গে সমঝোতা করতে যাওয়াটা কি . . . !

সুদীপাকে থামিয়ে দিয়ে মাইতি বলল, এখন ওসব কথা তুলবেন না দিদি . . . অনেক কিছু আছে . . . ব্যাপারটা একটু সেট্‌ল করুক . . . এখন আপনি আমায় বলুন রজতদার মৃত্যুদিন, নাকি তিথি, কোনটা ধরে বাৎসরিক হবে ! বাকি কথা হবে তো পরে । সুদীপা উদাসভাবে বললেন, আমি ওসব কোনোটাই ভাবছি না । আমি খুব চাপ আর টেনশানের মধ্যে আছি । মাইতি নাছোড় । বলল, আমি কি তাহলে শ্রীরামপুরে গিয়ে . . . আপনার শ্বশুরবাড়ির ওঁদের সঙ্গে কথা বলব ?

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বললেন, ওদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে . . . যা ইচ্ছে করতেই পারো । তবে আমার ব্যাপারে কোনো কথা, আলোচনা, না করলেই খুশি হবো ।

আমার সম্বন্ধে আপনি সেরকম ভাবছেন কেন দীপাদি !

না মাইতি . . . আমি ভাবছি না । ভাবতে চাইও নি ।

তাহলে আর ভাইটিকে অপরাধী করছেন কেন ?

একইসঙ্গে অবাক এবং বিভ্রান্ত বোধ করেছিলেন সুদীপা । দালালদের চরিত্র বুঝি এমনই হয় । কোনও কিছু এরা গায়ে মাখে না । শান্ত নিস্পাপ মুখে মিথ্যে কথা বলে । আন্তরিক ব্যবহারের অছিলায় নির্দ্বিধায় পকেট কাটে । করুণ চোখে তাকিয়ে বিষের ছুরি চালিয়ে দেয় । আবার গা-ঘেঁষাঘেসি করে থাকতে থাকতে দুর্বলতাগুলো জেনে নেয় . . . কিছুটা বিশ্বাসও অর্জন করে নেয় । ওপর ওপর সব কথায় সায় দেয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে স্বার্থসিদ্ধির ফিকির খোঁজে ।

আবার একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বলেছিলেন, শোনো মাইতি, ভ্যালুজ বলে একটা ব্যাপারে আছে . . . সেটা খুব পারসোনাল । ওটা বিবেকের মতোই ব্যাপার . . . হারিয়ে ফেললে আর খুঁজে পাওয়া মুস্কিল ।

মাইতি একটা মিথ্যে ঘনিষ্ঠতার ভাব দেখিয়ে বলল, সে তো একশ বার দিদি ।

তাহলে তুমি নিজেই সব থেকে ভাল জানো . . . তুমি অপরাধী কি না ! . . . অবশ্য সেটুকুও তুমি বুঝবে কিনা কে জানে !

পাঁচ কাজের মধ্যে ছোটখাট ভুলভ্রান্তি কি ঘটে না দিদি !

আমার সামনে একরকম, আর পিছনে আর একরকম কথা বলাটা তো ভুল নয় মাইতি . . . ওটা ইচ্ছাকৃত । ওটা যার যার স্বভাব ।

আপনি কি আমায় অবিশ্বাস করেন দিদি !

তাহলে নিশ্চয়ই ওদেশ থেকে টেলিফোন করে করে শুধু তোমার সঙ্গেই সব কথা আলোচনা করতাম না !

তবে ? আপনার কোন কথাটা আমি . . . ।

নিজেকে সংবরণ করে হাত তুললেন সুদীপা । মাইতিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এসব কথা আর আলোচনা করতে চাই না মাইতি . . .

তবে ওসি শ্যামল হালদারের সঙ্গে, অপু-সোনাদিদের সঙ্গে, তোমার যোগসাজশের কথা আমি জানি ।

সুদীপা খেয়াল করেছিলেন, হঠাৎই কয়েক মুহূর্তের জন্য মাইতির মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল ওই কথা শুনে ।

কিন্তু পোড়-খাওয়া ক্রিমিনাল-এর মতোই দ্রুত ও আবার স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার ভান করেছিল । মাথা নেড়ে বলেছিল, দীপাদি . . . কী বললে আপনি বিশ্বাস করবেন জানি না . . . কিন্তু একটা কথা জানবেন, আপনার কোনো ক্ষতি কিন্তু আমি করতে চাই নি . . . বরং উপকারই চেয়েছি ।

সুদীপা কথা বাড়ান নি । একটু পরে শুধু মন্তব্য করেছিলেন, আমার অভিজ্ঞতার পাল্লা অনেক ভারি হয়ে গেছে । নিজের লোকজন, দেশকে যে এতো কম চিনি, সে ধারণা আমার ছিল না । এখন তার মাশুল দিচ্ছি ।

মাইতি তারপরেও বলেছিল, কিন্তু আমাকে তার মধ্যে ফেলবেন না দিদি . . . যে - উপকার দাদা আর আপনার কাছ থেকে পেয়েছি . . . তা কি কোনোদিন ভুলতে পারি . . . !

সুদীপা অবাক হয়েই যাচ্ছিলেন ভেবে যে, এমন নেইয়াঁকুড়ে-শঠ-চতুর-ধান্দাবাজ অথচ ঠান্ডা মাথার মানুষ হয় কি করে ! একটু পরে বলেছিলেন, শোনো মাইতি, তোমাকে একেবারে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত . . . মানে ওই তালা ভাঙ্গার মিস্ত্রি আনা পর্যন্ত যা টাকাপয়সা দিয়েছি - যদি আরও কিছু বাকি থেকে থাকে, জানিও । আমি আর কদিন কলকাতায় আছি জানি না . . . পাওনাগন্ডা সব মিটিয়ে দিতে চাই . . . । মনে হয় তোমাকে বেশিই দেওয়া আছে । তবু বলে রাখলাম ।

সুদীপা খুব ভালই জানেন, ইতিমধ্যেই কোর্ট-লইয়ার-পালিশ-আরও নানান খাতে নানান সময়ে মাইতি যথেষ্ট টাকা-ই বার করে নিয়েছে . . . তাহলেও নিজের দিক থেকে পরিষ্কার হয়ে রইলেন । মাইতি যে আরও বড় দাঁও মারার জন্য এখন ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে, তাও বোঝেন । সুদীপার দোতালাটি যদি এবার বিক্রির ব্যবস্থা এবং অন্য আর একটি ফ্ল্যাট চিনিয়ে দেওয়ার আয়োজন যদি মাইতি করতে পারে, তাহলে মিডলম্যান হিসাবে দুদিক থেকেই ও ভাল ক্যাশ কামিয়ে নিতে পারে ।

কিন্তু সুদীপা বুঝতে পারেন, শুধু টাকা ম্যানেজ করে নেওয়াটাই সব না ।

মাইতিদের মতো বিবেকবর্জিত লোকেরা নিজেদের বাঁচানর জন্য, অন্যকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতেও ইতস্তত করবে না । তিন সপ্তাহ আগে দোতালার তালা ভাঙ্গার সেই ধুন্ধুমার উৎকণ্ঠার দিনেই সুদীপা বুঝেছিলেন, থানার বড়বাবু শ্যামল হালদারকে শেষপর্যন্ত সুদীপার ঘনিষ্ঠ নিবিড় সাহচর্যে আসার ব্যবস্থাটা মাইতিই করে দিয়েছিল । ভাবা যায় !

সেই বিভীষিকার সন্ধ্যা মনে পড়লে এখনও সর্বাঙ্গজুড়ে কাঁপুনি টের পান সুদীপা । . . . যাক্ ।

বাড়ির চারতলার ছাদের ওপর থেকে শরৎকালের সকাল দেখছিলেন সুদীপা । এসময় কলকাতা দিব্যি শান্ত শহর । ঝিরঝির হাওয়ায় মোলায়েম হিমেলভাব । আশপাশের উঁচু গাছের পাতায় শব্দ ওঠে । বৃষ্টি ধোওয়া আকাশ থেকে ধূসর মেঘের দল বিদায় নিয়েছে তাও বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল । এখন সকাল থেকেই আকাশ নীল । তুলোর মতো ছাড়া ছাড়া সাদা মেঘ দিগন্ত থেকে দিগন্তে ভেসে যায় । চতুর্দিকে স্নিগ্ধভাব ।

কয়েকদিন ধরে ঘুম ভাঙ্গার পরে দিনের আলো দেখলেই ছাদে উঠে আসেন সুদীপা। প্রীতিলতা অথবা বাড়ির সর্বক্ষণের প্রায় কত্রী কুসুমদি কোনো দিন আগেই উঠে পড়েন। সেদিন সকালের চা-এর মগটা নিয়েই সুদীপা ছাদে যান। পায়চারি করেন। কখনও হিমে ভেজা বেতের মোড়া মুছে নিয়ে, ছাদের বাগানের মধ্যেই বসে বসে প্রকৃতি উপভোগের চেষ্টা করেন। বড় টবের গাছে শিউলি ফুটতে শুরু করেছে। ঝরে পড়ে থাকে ছাদের ওপরেই। গা জুড়োনো হাওয়ায় মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। সুদীপার ভাল লাগে।

প্রীতিলতা বোঝেন মেয়েটার ওপর দিয়ে দুরন্ত ঝড় বয়ে চলেছে এক বছরের ওপর হয়ে গেল। শারীরিক-মানসিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক . . . কোনো দিক দিয়েই যে সুদীপা দেশে এসে পর্যন্ত রেহাই পান নি, প্রীতিলতা তাঁর সাধারণ জ্ঞান থেকেই সেটা বুঝতে পারেন। সম্প্রতি এটাও অনুমান করেন, হয়তো মেয়ে এবার নিজের জীবন সম্বন্ধে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফুরসৎ পেয়েছে, এবং কয়েকদিন ধরে সেদিকেই এগোনর ভাবনাচিন্তা করছে। হয়তো সেইজন্যই নিরালা ছাদে গিয়ে বসে খানিকক্ষণ। একা বসে ভাবে। . . আশি বছর বয়স হয়ে গেলেও, প্রীতিলতার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার। মনের দিক থেকে তিনি আধুনিক এবং সংস্কারমুক্তও বটে। আবার মেয়ের রুচি-বোধ-শিক্ষা . . . সামাজিক পরিচয়ের ব্যাপারেও সচেতন। দীপার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে একেবারে নিজের দিদি, বোনপো থেকে শুরু করে একের পর এক চেনা মানুষ ওকে উত্যক্ত করেছে এবং বিপদে ফেলেছে, তার অনেকটাই প্রীতিলতা জানেন। সবকিছু খুব পরিষ্কার জানতে না পারলেও, এটুকু টের পেয়েছেন, এতোকাল পরে দীপার দেশে ফিরে আসার পরিকল্পনা যেন কিছুতেই সহজ আর বাস্তব হয়ে উঠতে পারছে না। প্রবাসী বলেই যেন নিজের দিদি থেকে আরও অনেকেই ওর ওপর জেলাস; পিছনে লাগা, ঠকানো এবং উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। আর বোধহয় পেরে উঠছে না দীপা। তাহলে এই অকাল বৈধব্য নিয়ে মেয়ে যাবে কোথায়! ও তো কারুর ক্ষতি করেনি!

মায়ের নানান প্রশ্নেরই উত্তর অনেকদিন পর্যন্ত এড়িয়ে গেছেন সুদীপা। কিন্তু সেই দোতালার তালা ভাঙ্গার দিনের যুদ্ধ এবং ফ্ল্যাট উদ্ধার করার দিন থেকেই আস্তে আস্তে মেয়ে যে খানিকটা বিভ্রান্ত, ঝিমিয়ে পড়েছে, প্রীতিলতা তা খেয়াল করেছেন। দেশে ফিরে আসার জন্য যে উৎসাহ নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছিল, কোথায় যেন ঢিলে পড়ে গেছে সেই এনার্জিতে। . . .

পায়ে পায়ে প্রীতিলতাও সেদিন ছাদে উঠে এলেন। সকালের সূর্য উঠেছে কিন্তু আলোয় তাপ নেই। কদমগাছের পাতার ঝিলিমিলি ছায়া পড়েছে ছাদের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। মোড়া পেতে বসেছিলেন সুদীপা। তুলসিগাছে জল দেওয়ার অছিলায় এলেও, এগিয়ে গেলেন মেয়ের কাছে। ফুরফুরে হাওয়া বইছে ছাদের ওপরে।

তোর সঙ্গে দু-চার কথা বলব ভাবি . . . সে আর হয়ে উঠছে না।

হালকা হেসে মায়ের দিকে তাকালেন সুদীপা। — কেন মা! ইদানীং তো বাড়িতেই রয়েছি প্রায় সারাদিন।

রয়েছিস . . . কিন্তু হয় ফোনে কথা বলছিস . . . নয়তো কিছু ভেবে চলেছিস। মুখ দেখে তো বুঝি . . . !

মাথা নাড়লেন সুদীপা। — হ্যাঁ মা, তা ঠিকই বলেছো। ছাদে পড়ে থাকা পুরনো কাঠের চেয়ারটা দেখালেন। — বসবে একটু?

কুসুমের শরীরটা ভাল নেই . . . নীচে যেতে হবে। বলতে বলতেও, গঙ্গাজলের ঘটি পাশে রেখে বসলেন প্রীতিলতা। বললেন, আমি তো সবকিছু বুঝি না, জানিও না। তবু তোর জন্য মনে একটা অশান্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেবেছিলাম কেটে যাবে . . . কিন্তু . . . নাহ্।

চায়ের মগটা দু-হাতের তালুতে চেপে ধরে সুদীপা বললেন, তুমি মা তো . . . সেইজন্যই অশান্তি ভোগ করছো। কিছু কিছু টেরও পাচ্ছো। . . . কেন জানি না, কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে . . . তুই ঠিক নেই।

কী আর বলব তোমায় . . . যত দিন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আর ধকল নিতে পারছি না।

মাথা দোলালেন প্রীতিলতা। বললেন, প্রথমে মনে হয়েছিল তোর দোতালাটা উদ্ধার হলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে . . . ঠাকুর এবার মুখ তুলে চাইবেন।

সুদীপা হাসির মতো শব্দ করে বললেন, কী জানি মা, হয়তো ঠাকুর মুখ তুলে তাকিয়েছেন, কিন্তু আমি এখনও দেখতে পাইনি। কবে পাবো তাও জানি না।

একটা কথা মনে রাখতে হয়, প্রীতিলতা বললেন, দ্যাখ সুখ-দুঃখ কষ্ট কোনোটাই চিরকাল চেপে বসে থাকে না। সে তো জানি। কিন্তু সুখ না বুঝলেও, দুঃখকষ্ট থেকে খানিকটা উদ্ধার পাচ্ছি . . . সেই বোধটা তো হতে হবে !

সেটা কি একটুও টের পাচ্ছিস না ?

কী বলো তো মা . . . একটা জাল কেটে একটু বেরুতে না-বেরুতে মনে হচ্ছে আরও পাঁচটায় জড়িয়ে পড়ছি।

প্রীতিলতা বললেন, ওপর ওয়ালার নির্দেশ তো কেউ আর খন্ডাতে পারে না . . . কিন্তু আমাদের এখানে মুস্কিল হয়েছে, খোদার ওপর খোদকারি করার মতো লোক বেড়েছে। তারা আকাট গোমুখ্যু, লোভী-শয়তান অথচ ক্ষমতাবান . . . কিন্তু তারাই দন্ডমুন্ডের কর্তা . . . এমনকী কর্ত্রীও . . . । আবার কিছু সাধারণ লোকও তাদের গোলাম করছে . . . ।

মা যে কেন কথাগুলো বললেন, সবটা ধরতে পারলেন না সুদীপা। কিন্তু এদেশ তথা কলকাতার আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিই যে তাঁর বিপদে পড়ে যাওয়া প্রবসী মেয়েটার সাম্প্রতিক দুর্ভোগের কারণ, সেটা তিনি ঠিকই বুঝেছেন। আসলে সুদীপার ব্যক্তিজীবন যে এখানে কতখানি বিপন্ন হয়ে উঠছে, তা কি অনুমান করেন প্রীতিলতা ! মায়ের কাছে কতটাই বা সেইসব ব্যাপারে সোচ্চার হতে পারেন তিনি !

একটু আভাস দেওয়ার মতো সুদীপা বললেন, বুঝলে মা . . . গত একবছরে অনেকটা সময় তো কলকাতায় কাটালাম . . . রজত মারা যাওয়ার পরে চলেই আসবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু একের পর এক যা কিছু ঘটে চলল, এখনও চলেছে . . . আমার শরীর-মন-মেজাজ . . . কোনো কিছুই তাইতে ঠিক থাকছে না। সারাক্ষণ টেনশন-অশান্তি . . . বিপদে পড়ার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি।

প্রীতিলতা বললেন, এখানে মুখে যারা মেয়েদের স্বাধীনতার কথা, রক্ষার কথা বলে, তলেতলে সেই রক্ষকরাই ভক্ষক। তুই তার-ওপর অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকিস . . . কথাটা শেষ করলেন না প্রীতিলতা।

সুদীপা বোঝেন, মা-র ওই কথাটার পরেও আরো অনেক না-বলা শব্দ ছিল।

ঘটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রীতিলতা একটু পরে। বেরুবি কোথাও ?

সুদীপা বসে থেকেই বললেন, দেখি। রুপা আসবে। কাছেপিঠে দু-একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব হয়তো। . . .

ঠান্ডা ঠান্ডা সকালের আলো হাওয়ায় একলা ছাদে বসে রইলেন সুদীপা। নানান ভাবনার টানাপোড়েন মনের মধ্যে। একা মানুষেরও জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ না। স্বাধীনতা শব্দের মধ্যেই অধীনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ . . . নিজের কাছে, নিজের জন্যও কতরকম অধীনতা মানুষের ! কখনও কখনও একাকিত্ব-ও বুঝি রাজত্ব করে সেই অনিবার্য অধীনতার ওপর।

বাড়ির দোতালায় সেই তালা ভাঙ্গার দিনটায়, একইসঙ্গে ত্রাসে-উদ্বেগে-আতংকে-আশংকায় . . . প্রায় বুঝি শেষই হয়ে গিয়েছিলেন সুদীপা। একটা গন্ডগোলের ব্যাপার হবে জানতেন। কিন্তু না হলে তাঁর বাড়ি উদ্ধার হবে না, সেটাও বুঝতে পারছিলেন। অথচ তার মধ্যেই যে আবার অন্য এক বিপদের থাবা উদ্যত হতে পারে সেটা মাথায় আসে নি।

ঘটনার আগের দিন মাইতি এসেছিল। টিপটিপ বৃষ্টি আর মেঘলা আকাশ বলে বিকেল ফুরিয়ে এসেছিল তাড়াতাড়ি। মাইতির ভূমিকা নিয়ে তখনই কিছুটা দোলাচলে থাকলেও, নির্ভর না করেও উপায় ছিল না সুদীপার। কেননা টাকা খরচ করলেও, একটা বাড়ির তালা-গেট-দরজা ভেঙ্গে ঢোকার আয়োজন খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষ করে জনঅধ্যুষিত পাড়ার মধ্যে। আবার কোনও একটা সময় সেটা না করলেও, স্যাঁতানো বন্ধ অবস্থায় বাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে।

মাইতি কিছুটা ত্রস্ত পায়ে তিনতলায় ঢুকেছিল।

বেশ মোটা অঙ্কের টাকার কথা আগেই বলাছিল। সুদীপাও জানতেন, টাকা খরচ না করলে দোতালার বন্ধ ফ্ল্যাট খোলা যাবে না এবং তাঁর দখল নেওয়ার উপায় থাকবে না। টাকার থলি হাতে নিয়ে, বেরিয়ে যাওয়ার আগে মাইতি বলেছিল, কাল এই সন্ধের সময়ই অপারেশন . . . সাত আটখানা তালা . . . বুঝতেই পারছেন সময় তো লাগবেই। কিন্তু চিন্তা করবেন না . . . মিস্ত্রি-ইনস্ট্রুমেন্ট-মস্তান . . . সব ফিট করেছি। যতটা সম্ভব নিঃসাড়ে কাজ শুরু হবে . . . কিন্তু শেষপর্যন্ত শব্দাশব্দি তো হবেই, কিছু করার নেই। আর তখনই হৈ-হল্লা গন্ডগোলের সম্ভাবনা . . . দেখা যাবে কী হয় . . .।

সুদীপা জিগ্যেস করেছিলেন, অপুরা কিছু জানে ?

মনে হয় — না। কিন্তু ওদের খোচর তো সবসময়ই ধারে কাছে থাকে . . . খবর পাবেই কিছুক্ষণের মধ্যে . . .।

তাহলে ! তখন তো একটা সাংঘাতিক গোলমাল . . .

সেই ঝুঁকিটা নিতেই হবে দীপাদি . . . কিন্তু আইনত বাড়ি তো আমাদের . . .।

পুলিশ আসবে না ?

মাইতি একটু হেসে বলেছিল, সোজাসুজি তো আসবে না . . . কিন্তু যাতে দরকারে ঠেকা দেয়, সে ব্যবস্থা হয়েছে। টাকার ব্যাগটা তুলে, দেখিয়ে বলেছিল, এখান থেকে এ্যাডভান্স্ ফিফ্‌টি থাউজেন্ড শুধু . . . যাক বাদ দিন। মাইতি আর বলেছিল, হ্যাঁ আসল কথা হচ্ছে, মাসিমা আর কুসুমদিকে কিন্তু কোথাও পাঠিয়ে দেবেন - বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত।

সুদীপা বললেন, সে ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আমিও থাকবো না . . . আমার থেকে তো কোনো লাভ নেই . . .।

মাইতি একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল।

না-না-না . . . তা কি করে হয় ! আপনাকে থাকতেই হবে। তবে তিনতলায় চুপচাপ একা থাকবেন . . . মনে হয় দোতালায় নামার দরকার হবে না . . .। যদি না নেহাৎ পুলিশের ট্রুপ এসে হাজির হয় . . . কিংবা . . .। তখন তো পেপারস্ দেখতে হবে . . .।

তাহলে যে বললে . . . পুলিশ যাতে ঠেকা দেয় . . .

শুনুন দিদি . . . ব্যবস্থা সব করেছি। কিন্তু সিচুয়েশন কোনদিকে টার্ন নেবে আগে থাকতে কি বলা যায় এসব ক্ষেত্রে !

প্রীতিলতা আর কুসুমদিকে ভারত সেবাশ্রমে পাঠিয়ে বিকেল থেকে বাড়িতে একাই ছিলেন সুদীপা। যথারীতি সেদিনও মেঘলা আকাশ, আঁধার গাঢ় হয়ে এসেছিল সন্ধে হতে হতেই। মাঝখানে দমকা হাওয়ার সঙ্গে উড়ো বৃষ্টিও হচ্ছিল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদই ছোটখাট শব্দাশব্দি পেয়ে সুদীপা বুঝেছিলেন, কাজ শুরু হয়ে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন তিনতলায় আলো নিবিয়ে। জানতেন ভালই সময় লাগবে, ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।

প্রায় আধঘন্টা হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার তিনতলা থেকে নীচেয় চোখ রেখেছিলেন সুদীপা। না . . . এখনও পর্যন্ত কোনও অস্বাভাবিকতা কিংবা সতর্কতা বা উত্তেজনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তালা এবং চেন ভাঙ্গার কাজ চলছে বুঝতে পারছিলেন। আর সেইসময় দরজায় ঠুক-ঠুক করে একটা নক্ শুনেছিলেন। এগিয়ে গিয়েছিলেন সুদীপা। ভেবেছিলেন

মাইতি বোধহয় তাঁকে আশ্বস্ত করতে এসেছে। তাও চাপা স্বরে জিগ্যেস করেছিলেন — কে ? বাইরে থেকেও চাপা স্বরে উত্তর এসেছিল, দরজাটা খুলুন ম্যাডাম . . . চিন্তা নেই . . . আমি আপনাদেরই লোক।

গলাটা কি আগে শুনেছেন সুদীপা ! দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এবং অবাক, সন্ত্রস্থ হয়ে দেখেছিলেন থানার বড়বাবু শ্যামল হালদার এসে দাঁড়িয়েছেন একেবারে প্রায় তাঁর মুখোমুখি। মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে গিয়েছিল — কী ব্যাপার . . . আপনি !!

ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে সুদীপার গায়ে স্পর্শ করেই ভেতরে ঢুকে এসেছিলেন শ্যামল হালদার। ক্রুর হাসি মেখে বলেছিলেন, অন্য কাউকে আশা করেছিলেন নাকি ! বলতে বলতেই পিছন ফিরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঘুরে বলেছিলেন, ভয় নেই . . . নিচে অপারেশন স্মুদ্‌লি চলছে . . . এখান থেকে কথাবার্তার শব্দ না যাওয়াই ভাল, সেইজন্যই . . . ।

কিন্তু আপনি . . . এসময়ে আজ . . . এখানে . . . !

কী আশ্চর্য, এতো অবাক হচ্ছেন কেন ! পুলিশ ছাড়াও আমি তো আপনার বন্ধুই হতে চেয়েছি সেদিন থেকে . . . । সুদীপা বুঝে গিয়েছিলেন তিনি খেঁচাকলে পড়ে গেছেন। না পারবেন সরে যেত কিংবা চেঁচাতে, না পারবেন শ্যামল হালদারকে তাড়াতে। তাসত্বেও সাহস করে বলেছিলেন, মিষ্টার হালদার . . . , য়্যু বেটার লীভ টুডে। আমি খুব টেনশনে আছি। চলে যান প্লিস। . . . হাউ ক্যান আই সুইটহার্ট ! আপনি কি জানেন আপনাদের গলির মুখে আমার জীপটা-ই আজ আপনার সব থেকে বড় সিকিউরিটি ! তাহলে চলে যাই কি করে ? নিচেয় তো এখনও একঘন্টার ওপর কাজ আছে . . . ।

কিন্তু এখানে আপনি কী চান . . . আপনাকে আমি এক কাপ চা ও অফার করতে পারব না।

দরকার নেই তো . . . আপনার সঙ্গ ছাড়া আর কিছুই তো চাই না . . . প্লীজ জাস্ট রিল্যাকস্ করে বসুন। কাছেই আসুন না।

সুদীপাকে দুহাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন বড়বাবু। সুদীপা বুঝতে পারছিলেন এবার পর পর কী কী হবে, ঘটবে। এবং যথারীতি তারই সূচনা হয়েছিল, শ্যামলের দুই থাবা সুদীপার ভরাট নিতম্বকে নিবিড়ভাবে নিজের দিকে আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে।

সুদীপা প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিলেন। — প্লীজ বড়বাবু, আপনার এই আচরণ কিন্তু মানায় না।

ঘড়ঘড়ে স্বরে শ্যামল বললেন, ট্রাস্ট মি . . . নো টেনশন . . . আমার আচরণ আপনাকে কষ্ট দেবে না ডালিং।

সুদীপা বাধা দিতে চাওয়ার মধ্যেই বুঝতে পারছিলেন শ্যামল দুর্বার হয়ে উঠছে। উত্তপ্ত শ্বাস পড়ছে তাঁর শরীরের যত্র-তত্র। শক্তিতে পেরে উঠছেন না সুদীপা। নিপুন হাতে তাঁর উর্ধাঙ্গের অন্তর্বাস সরিয়ে ফেলেছেন শ্যামল . . . মুখ ডুবিয়েছেন বুকের মাঝখানে। মিনিটে মিনিটে প্রায় উন্মত্ত হতে হতে দু-হাতে কোলপাঁজা করে তুলে নিলেন সুদীপাকে। মুখের কাছে মুখ ডুবিয়ে রেখেই বললেন, কোন ঘরে শোবো ডালিং। লেট আস প্লে আ গুড গেম।

সুদীপার আর কথা বলার মত ক্ষমতা ছিল না, চরম পরিণতি তাঁকে অসহায় ভাবে মানতেই হবে। বারান্দার উলটো দিকে ঘরে বিছানায় তাঁকে শুইয়ে ফেলেছেন শ্যামল। নিজেকে সাব্যস্ত এবং উন্মক্ত করতে করতেই মুখ ঘসতে শুরু করেছেন সুদীপার তল-পেট আর জঙ্ঘার ওপর . . . আলতো ভাবে কামড়াচ্ছেন। একহাতে খুলে ফেলেছেন নিজের ট্রাউজারস . . . । আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আস্তে শুরু হয়ে জোরে বাজতে লাগল বড়বাবুর (ট্রাউজারের পকেট থেকে) মোবাইল ফোন। কিন্তু হাল ছাড়লেন না। সুদীপার বুকের ওপর মুখ রেখেই, সরি . . . মাই ডালিং . . . বলতে বলতে মোবাইল বার করে ফেলেছিলেন পকেট থেকে। এবং যে কোনো কারণেই হোক, স্ক্রিনের ওপর চোখ রেখেই যেন ওই অবস্থাতেও তটস্থ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ বলুন স্যার . . . আমি এস হালদার . . . হ্যাঁ হ্যাঁ ওসি . . . ।

উলটো দিকের কথা শুনতে পান নি সুদীপা । কিন্তু বুঝেছিলেন, বেশ ওপর মহল থেকেই কোনও একটা ব্যাপারে তলব করা হচ্ছিল হালদারকে । তার পর মুহূর্তেই বুঝেছিলেন, এবং অবাকও হয়েছিলেন, ওসিকে কিছু জানানো হচ্ছিল তাঁরই ফ্ল্যাটের ব্যাপারে । শ্যামল টেলিফোনে বলছিলেন, আমি জানি স্যার . . . মিসেস সুদীপা রায় এসেছিলেন থানায় . . . উই মাস্ট টেক এ্যাডিকুয়েট কেয়ার স্যার . . . আই নো, শি ইজ আ রেস্পেক্টেবল লেডি . . . না স্যার ব্রিটিশ হাইকমিশন ইনভলব হতে পারে . . . সেটা জানতাম না . . . না-না মিনিস্টার পর্যন্ত যাওয়ার কী দরকার . . . আমি আজই দেখছি স্যার . . . ।

সুদীপা বুঝেছিলেন, শ্যামল হালদারের শরীর শিথিল হয়ে গিয়েছিল । প্রায় তুঙ্গে উঠেও নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষোভ ছিল, কিন্তু বাকিটার জন্য আর সাহস ছিল না । তাসত্বেও বলেছিলেন, অতদূর যাওয়ার তো দরকার ছিল না ম্যাডাম . . . আমি আপনার ফ্রেন্ড তো ছিলামই . . . । নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, এর পরেও থাকবো । সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন, বড় কর্তারা দূরে থাকে, ফোরফ্রন্টে এই আমিই কিন্তু . . . ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম . . . য়্যু আর রিয়্যালি স্পাইসি এ্যান্ড চার্মিং . . . দেখা হবে ।

সুদীপা একটু পরেই বুঝেছিলেন — এসবই বন্ধু এবং আমলা সঞ্জয়েরই যোগাযোগে ঘটেছে । মাঝখানে কয়েকদিন কথাবার্তা না হলেও সঞ্জয় যে ওপর মহলে যোগাযোগ করছে, করবে, সুদীপা জানতেন ।

কিন্তু মাইতির আয়োজনে যোগাসাজশে ইতিমধ্যে তালা ভাঙ্গার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল । কাজটা তো পড়েই ছিল, এবং সব থেকে দরকারি কাজ । সুতরাং বাতিল করেন নি । কিন্তু কী ভাগ্যিস ইতিমধ্যে সঞ্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল !

অবশ্য না-হলেই বা কী হতো ! ধর্ষিতা বিশেষণ টুকু জুটতে আর কতটুকুই বা বাকী ছিল ! সত্যি কি আর কিছু বাকি ছিল ! মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন সুদীপা ।

ছাদে পায়চারি করতে-করতে কয়েকদিন আগেকার আর একটি ঘটনার কথাও ভাবলেন । বেশ কয়েকবারই ভেবেছেন . . . হয়তো ভাবতে বাধ্য হয়েছেন নিজের সংস্কৃতি-সংস্কার আর শুচিবোধের নিরিখে ।

সঞ্জয়ের সঙ্গেও অপ্রত্যাশিত ভাবে যে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল . . . তাকে কী বলবেন সুদীপা ! ধর্ষণ . . . নাকি অসতর্ক আবেগ আর প্রীতিময়তায় ভেসে যেতে যেতে শরীর নিজস্ব নিয়মেই একে অপরকে আপন করে নিয়েছিল ! একটানা বেশ কিছুক্ষণ দুজনে কথা বলতে বলতে সঞ্জয় অবশ্যই কিঞ্চিৎ প্রগলভ হয়েছিল । কিন্তু তারপর ? সঞ্জয় কি নিজের শিক্ষা-রুচি-পরিচিতি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সত্যি সেই উদ্যোগ নিতে পারতো, যদি না সুদীপার সমর্থন থাকতো !

দিদি . . . নিচেয় এসো . . . মাসিমা ডাকছে . . . ও বাড়ির দিদি টেলিফোন করেছে . . . ।

প্রায় যেন একটা ঝাঁকানি খেয়েই সচেতন হয়ে উঠলেন সুদীপা । দ্রুত বললেন, ওহ্ আচ্ছা . . . চলো যাচ্ছি ।

সকালের কাজের বউটি, প্রতিমা তারপরেও বলল, এখনই এসো . . . ছোড়দিদি ফোন ধরে আছে ।

সুদীপার ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল । কিন্তু তার উৎসটা রইল । নিজের কাছে তার এই জবাবদিহি খুব জরুরি ।

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা । ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন । প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত । 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন ।

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ৬

[পূর্ব কথাঃ রঘু উচ্চ মাধ্যমিক এর পড়া শুরু করে বুঝতে পারল যে অংক ও ইংরেজিতে তার সাহায্য প্রয়োজন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অর্ধেক ফীস-এ ওই দুটো বিষয়ের জন্য কোচিং ক্লাসে ভর্তি হল সে। একদিন ঘরে বসে রঘু রোজ রাতের মত পড়াশোনা করছিল। ঘরে সে একাই ছিল, কারণ মুরারী আজকাল মাঝে মাঝে রাতে ওর বন্ধু কার্তিকের সাথে আড্ডা মারতে যায়! রাত বারোটা নাগাদ, বৃষ্টির মধ্যে মুরারী একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চা-ঘরে ফিরল। ওরা দুজনেই তখন নেশাগ্রস্ত ছিল। মেয়েটার চাল চলনে রঘু অস্বস্তি বোধ করছিল। তাকে জবরদস্তি কাছে টানার চেষ্টা করায় রঘু মেয়েটার উপর রেগে ও বিরক্ত হয়ে কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে গেল! সেই রাতটা স্টোর রুমে কাটিয়ে ভোর হতে না হতেই কাউকে কিছু না বলে সে চুপচাপ বেরিয়ে গেল! তারপর হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসে রইল।]

* * * * *

রঘু দোকানে ফিরতেই বাদল চীৎকার করে উঠল, ওই তো রঘুদা এসে গেছে। দৌড়ে এগিয়ে গেল সে – "সকাল সকাল কোথায় গেছিলে রঘুদা? মুরারীদা খুব চিন্তা করছিল!" রঘু কোনো উত্তর দিল না। বাদলের কাঁধে একটা হাত রাখল। তারপর সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল হাত মুখ ধুতে। সেখান থেকে বেরোতেই নিত্যানন্দ এক কাপ ধূমায়িত গরম চা রঘুর হাতে দিয়ে গেল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বেশ যেন একটা আরাম হল ওর। বাদল জিজ্ঞাসা করল – "শুধু চা খাচ্ছ? বিস্কুট নেবে?" রঘু মাথা নাড়ল – "না রে, এখন থাক।"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুরারী চোরা চাউনিতে রঘুকে পর্যবেক্ষণ করছিল! রঘু গম্ভীর ভাবে চা শেষ করে রান্নাঘরে ঢুকল। ততক্ষণে বাদল আর নিত্যানন্দ পিছনের কলতলায় যে যার কাজে লেগে গেছে। একটু পরেই সীতারাম বাজার থেকে সব্জীপাতি নিয়ে আসবে – খরিদ্দাররাও আসতে শুরু করবে। রঘু তাই পাকোড়ার জন্য ব্যাসন, তেল এসব বার করতে যাচ্ছিল। পাশ থেকে মুরারী বলল – "বড্ড বাড়া বাড়ি করছিস তুই। অত নাটক করার কি হয়েছে?"

রঘু ঘুরে দাঁড়ালো, রুখে জবাব দিল – "কি নাটক করেছি আমি? তুমি কাল যা করেছ, তার পরে আর কথা বলতে এসো না আমার সঙ্গে।" রাগে গরগর করতে লাগল মুরারী! – "বেশী সতীপনা করতে আসিস না। এমন একখানা থাবড়া দেবো, সব দাঁতগুলো পড়ে যাবে!"

তেজী ঘোড়ার মত বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো রঘু! দুই হাত কোমরে রেখে সমান তেজের সাথে বলল – "মারবে আমাকে? মারো, মেরে দ্যাখ কি হয়! আমি যাব দাদুর কাছে। কালকের সব কথা দাদুকে বলব। তারপর তুমি দেখ, কী হয়!"

রঘুর এই রুদ্রমূর্তি মুরারীর সম্পূর্ণ অচেনা। আজ ওর এই চেহারা মুরারীর চোখে আঙুল দিয়ে যেন স্পষ্ট করে বলে দিল, রঘু আজ আর সেই আট বছরের ছোট্ট ছেলেটি নেই! সে এখন আঠারো বছরের তাগড়া জোয়ান! হঠাৎ কেমন থতিয়ে গেল মুরারী। নিবু নিবু তেজে বলল – "এরকম ছোট খাট একটা ব্যাপার নিয়ে একেবারে বড়বাবু পর্যন্ত যাবার কোনও মানে হয়?"

চোখ কুঁচকে রঘু বলল – "ছোট খাট ব্যাপার?"

এবার মুরারীর তেজ একেবারেই নিবে গেল। পরিস্থিতি সামাল দিতে সে বলে – "না, মানে মানছি, ভুল নাহয় একটা হয়েই গেছে।" রঘুর দিকে দু পা এগিয়ে এসে মুরারী বলল – "আচ্ছা রঘু, তুই তো এতদিন ধরে আমায় দেখছিস। কখনও

কি এরকম করেছি ? আসলে কি জানিস, বিজলীর সাথে আমার কিন্তু তেমন কোনো সম্পর্কই নেই ! ওর দোস্তি তো কার্তিকের সাথে ! কাল কার্তিকের ঘরে হঠাৎ ওর গ্রামের বাড়ির লোকজন এসে যাওয়ায় অবস্থাটা এমন হল ! তার উপর ঝড় বৃষ্টি ! একেবারে পুরো ফেঁসে গেলাম!"

একটু থামল মুরারী। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল সীতারাম বাজার নিয়ে ঢুকছে, পিছন পিছন বিল্টুও আসছে। হঠাৎ করে মুরারী সব কিছু ঝেড়ে ফেলার মত করে বলে উঠল – "যাক গে যাক। যা হয়ে গেছে তা গেছে। আমি তোকে বলছি, ও'রকম আর হবে না ! যা এখন কাজে হাত লাগা। অনেক বেলা হয়ে গেল। সীতারামও এসে গেছে !"

মুরারীর দৃষ্টি অনুসরণ করে রঘুও একবার বাইরের দিকে তাকাল। তারপর আবার মুরারীর দিকে কড়া দৃষ্টিতে চেয়ে শাসনের সুরে বলল – "কথা দিয়েছ। মনে থাকে যেন। দ্বিতীয় বার হলে সোজা দাদুর কাছে যাব!" কথাটা শেষ করে রঘু গামলা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজ রঘুর মনটা খুব ভালো লাগছিল। ভালো লাগবার যথেষ্ট কারণ ছিল। দু দিন আগে সুজয় স্যার টিউশন ক্লাসে অংকের যে পরীক্ষা নিয়েছিলেন, আজ সেই খাতাগুলো ফেরৎ দিলেন। রঘু পরীক্ষায় পঞ্চাশে বিয়াল্লিশ পেয়েছে। আর ওটাই সবচেয়ে বেশী নম্বর ! ওর ধারে পাশে আর কেউ নেই। স্যার রঘুকে উৎসাহ দিয়ে অনেক প্রশংসা করছিলেন ! রঘুর তখন আনন্দও হচ্ছিল, আবার একটু লজ্জা লজ্জাও লাগছিল। ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েরা ওকে যেন কেমন করে দেখছিল। এমনি তে তো ক্লাসে কেউ রঘুর সাথে তেমন কথাও বলে না, বা তাকিয়েও দেখে না ! তাতে অবশ্য রঘু বেশ স্বস্তিই বোধ করে। কারণ ও বেশ বুঝতে পারে যে ক্লাসের অন্য ছেলে মেয়েদের সাথে তার পোশাকে আশাকে, কথা বার্তায়, দৈনন্দিন জীবন যাপনে কোথাও কোনো মিল নেই ! কি নিয়ে ওদের সাথে কথা বলবে রঘু ? তার চেয়ে এই ভালো। ক্লাসের এক কোনে বসে স্যারের কথা শোনে, অংক করে, আর ক্লাস শেষ হলেই চা-ঘরে ফিরে যায়। এতেই সে স্বস্তি বোধ করে। এরকমই ভালো লাগে তার।

কোচিং ক্লাসের শেষে ঘর থেকে বেরোতেই অঙ্কিত এসে রঘুর সামনে দাঁড়ালো – "রঘুনাথ তোমার সাথে একটু কথা আছে !" ক্লাসের মধ্যে একমাত্র অঙ্কিতের সাথেই রঘুর একটু কথাবার্তা হয়। ছেলেটাকে বেশ ভালো লাগে রঘুর। কিন্তু, এখন এ সময় রঘুর সাথে কি কথা থাকতে পারে অঙ্কিতের ? একটু অবাক হয়ে রঘু জিজ্ঞাসা করে – "কি বলবে বলো ?" আশেপাশে দেখে নিয়ে অঙ্কিত বলে – "তুমি তো এখন বাড়ি ফিরবে ? চলো, আমিও ওদিক দিয়েই যাব। যেতে যেতেই কথা বলব !"

– "কিন্তু আমি তো চা-ঘরে থাকি। তুমি ওদিকে কোথায় . . . ?"

রঘুকে থামিয়ে দিয়ে অঙ্কিত বলে ওঠে – "আমি জানি তুমি চা-ঘরে থাক। আমার বাড়ি ওখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। না হয় একটু ঘুরে যাব !"

যেতে যেতে অঙ্কিত অনেক কথা বলছিল। তবে তার মধ্যে আসল কথাটা ছিল – কোচিং নেওয়া সত্ত্বেও তার অংক নিয়ে এখনও বেশ অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্যই ও ক'দিন রঘুর সঙ্গে একসাথে অংক প্র্যাকটিস করতে চায় ! কথাটা শুনে রঘু বেশ খুশী হলেও অঙ্কিতের প্রস্তাবে চট করে রাজি হতে পারছিল না। ইতস্তত করে বলল – "কিন্তু একসঙ্গে পড়াশোনা করব, কি করে ? আমি তো পড়তে বসি রাতের খাওয়া দাওয়ার পর। রাত সাড়ে নটা দশটায় ! তুমি তখন চা-ঘরে আসবে ? আর যদিই বা আস, পড়াশোনার পর রাত বারোটায় ফিরবে কি করে ? তোমার বাড়িতে কিছু বলবে না ?"

একটু মাথা চুলকে, কপাল কুঁচকে অঙ্কিত বলল – "এটা একটা সমস্যা ঠিকই, কিন্তু ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। যেদিন তোমার বাড়ি পড়তে যাব, সেদিন রাতে আর বাড়ি ফিরবো না। তোমাদের ওখানেই ঘুমিয়ে যাব!" অঙ্কিত রঘুর হাত দুটো

জড়িয়ে ধরে বলল – "অংকে আমাকে ভালো নম্বর পেতেই হবে। তুমি আপত্তি কোরোনা, রঘুনাথ ! তুমি একটু সাহায্য করলে আমি তোমার মত না হলেও কিছুটা নিশ্চয়ই উন্নতি করতে পারব !"

কিছুদিন আগে পর্যন্ত চা-ঘরের এলাকায় সন্ধ্যার পর লোকজন বিশেষ চলাচল করত না। এদিকে বাড়ি ঘর, দোকান পাট কিছুই প্রায় নেই। তবে কদিন হল, জলাজমির পরের খালি জায়গাটায় একটা পেট্রোল পাম্প হয়েছে। এর আগে ওখানে স্থানীয় ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট এসব খেলত। পেট্রোল পাম্প চালু হতে না হতেই ওর পাশে একটা কোল্ড ড্রিংক, চানাচুর ইত্যাদির ছোট্ট দোকান আর টায়ার পাঙ্কচার রিপেয়ারের দোকান বসে গেছে। আজকাল রাত নটা-সাড়ে নটা পর্যন্ত এদিকে লোকজন যাতায়াত করে।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে রাত সাড়ে নটার মধ্যে অঙ্কিত চা-ঘরে চলে আসে। রোজ নয়, সপ্তাহে দুদিন। নিজেরাই সেটা ঠিক করে নিয়েছে। খুব উৎসাহ দুজনের। রঘুর খুব ভালো লাগে। একটা অন্য রকমের আনন্দ। এখন আর রাতে পড়তে বসে আগের মত ঘুমও পায় না। অঙ্কিত ওর স্কুলের নোট্স, ইউনিট টেস্টের প্রশ্নপত্র – সব রঘুকে দেয় ! আর রঘুও ওর সাধ্য মত অংক করতে অঙ্কিতকে সাহায্য করে !

কিছুদিন পর অঙ্কিত বলল – "এভাবে তো ইংরেজি, বাংলাও আমরা একসাথে পড়তে পারি !"

রঘু উৎসাহিত হয়ে বলে – "আমার তো তাহলে খুব উপকার হয় ! ইংরেজি আর বাংলাতে তোর স্কুলের নোটস, প্রশ্নপত্র সব পাব। কিন্তু তাতে অংকের সময়টা বেশ কমে যাবে !"

কিছু একটা চিন্তা করে অঙ্কিত বলল – "এক কাজ করি, সপ্তাহে আর একটা দিন আমরা বাড়িয়ে নিই !"

সঙ্গে সঙ্গে রঘু মাথা নেড়ে বলে – "ভালো হয় তাহলে। এক কাজ করি। তুই তো দু দিন আসছিস এখানে। একটা দিন না হয় আমি তোদের বাড়িতে চলে যাব। দাদুকে জানিয়ে . . . !" রঘু কথা শেষ করার আগেই ব্যস্ত হয়ে অঙ্কিত বলে – "না না, তার দরকার নেই। আমিই আসব। যেমন আসছি। কোনও অসুবিধা হবে না !"

অঙ্কিতের কথায় রঘু বেশ অবাক হয়ে গেল। কিছুটা আহতও। চকিতে মনে হল, অঙ্কিত কি ওকে বিশ্বাস করে না ? নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে ভরসা পায় না ? নাকি ওর বাবা-মার বারণ আছে ? যাই হোক, মনে একটা ধাক্কা লাগলেও রঘু মুখে কিছু প্রকাশ করল না। শুধু ঘাড় নেড়ে বলল – "আচ্ছা তবে তাই কর। দিনটাও তুই ঠিক করে নে !"

এর তিন চার দিন পরের কথা, সেদিনও রাতে পড়াশোনার জন্য অঙ্কিতের চা-ঘরে আসবার কথা ছিল। কিন্তু সে এলো না। রঘু বই খাতা ছড়িয়ে বসেছিল। পড়ায় তেমন মন লাগছিল না। বারে বারে ঘুরে ফিরে অঙ্কিতের কথাই মনে আসছিল তার।

অঙ্কিতের বাবা কালিচক হাইস্কুলে পিওনের কাজ করে। মা, ঘর সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেলাইয়ের কাজ করে। এই বাড়তি উপার্জন অঙ্কিতের কোচিং ক্লাস বা বাড়তি ছোট খাট প্রয়োজনে কাজে আসে। এসব কথা অঙ্কিতই তাকে বলেছে ! ওর একটা ছোট বোন আছে। বছর দশেক বয়স। নাম ফুলঝুরি। নাচতে খুব ভালোবাসে। অঙ্কিতের কথা শুনেই বোঝা যায়, ও বোনকে খুব ভালোবাসে !

রঘু ভাবে – অঙ্কিত কত ভাগ্যবান। ওর কি সুন্দর একটা পরিবার আছে। ঠিক গল্পের মত মায়া মমতা ঘেরা একটা সংসার। হাসি খুশী গল্পে আনন্দে ওদের বাড়িটা নিশ্চয়ই সবসময় ভরে থাকে। রঘুর তো বাড়ি টাড়ি কিছু নেই ! চা-ঘরেই থাকে। এখানেই বড় হয়েছে সে। ওর পিতৃ পরিচয় নেই ! এসব কথা তো আর লুকোচাপা নেই, অনেকেই জানে ! হয়তো অঙ্কিতের বাবা-মা এসব জেনে ওকে রঘুর সাথে মিশতে দিতে চায় না ! তাই বোধহয় সেদিন রঘু ওদের বাড়িতে যাবে বলায়

অঙ্কিত ওভাবে ব্যস্ত হয়ে না না করে উঠেছিল ! কি জানি হয়তো অঙ্কিতের এখানে এসে পড়াটাও ওনারা পছন্দ করেছেন না। ওদের একসাথে বসে পড়াশোনাও হয়তো বন্ধ হয়ে গেল। রঘুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, ওর ভাগ্যটাই খারাপ। যা কিছু ওর ভালো লাগে, সেটাই ওর কপালে বেশি দিন টেঁকে না !

পরদিন কোচিং ক্লাসেও অঙ্কিত অনুপস্থিত দেখে রঘুর একটু চিন্তা হল। যথেষ্ট কারণ না থাকলে অঙ্কিত ক্লাস কামাই করে না। পল্লব আর অঙ্কিত এক পাড়াতেই থাকে, একই স্কুলে পড়ে। ওর কাছ থেকেই জানা গেল অঙ্কিতের মায়ের মাথা ফেটে গেছে ! মাকে নিয়ে ও ডাক্তার বদ্যি করছে। ওই সব নিয়েই সে ব্যস্ত আছে।

খবরটা শুনে রঘু আর দেরি করল না। কোচিং ক্লাস করে ফিরবার পথে অঙ্কিতের বাড়ি গেল। দরজা খুলে রঘুকে দেখে অঙ্কিত প্রথমে খুব অবাক হয়ে গেল ! তারপরই দুহাতে রঘুকে জড়িয়ে ধরে বলল – "রঘু তুই এসেছিস ? আমার খুব একা লাগছিল !"

অঙ্কিতের কথাটা রঘুর একটু কানে লাগল ! একা লাগছে কেন ? তবে তার কথাটা রঘু পুরো অনুধাবন করতে না পারলেও বন্ধুর বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে সে বুঝতে পারছিল যে অঙ্কিতের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে ! আস্তে করে রঘু জানতে চাইল – "মাসীমা কেমন আছে এখন ? মাথা ফাটল কি করে ?" ছলছলে চোখদুটো মুছে নিয়ে অঙ্কিত উত্তর দিল – "পরে বলব ! আগে চল, মা'র কাছে যাই।"

পাশের ঘরের বিছানায় অঙ্কিতের মা চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। শীর্ণ, দূর্বল চেহারা। মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। হাতে একটা বই নিয়ে ফুলঝুরি মায়ের পাশে শুকনো মুখে বসেছিল। অঙ্কিত ঘরে ঢুকে বলল – "মা, রঘু তোমায় দেখতে এসেছে !" অঙ্কিতের মা চোখ খুলে রঘুকে দেখে ক্লান্ত একটা হাসি মুখে নিয়ে বলল – "আমার ছেলে তোমার কথা খুব বলে ! তুমি কত ভালো, কত কষ্ট করে তুমি পড়াশোনা করছ, সব আমি ওর কাছে শুনেছি।"

রঘু ওনার দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনিতে রঘুর মায়ের সঙ্গে চেহারায় বিশেষ মিল নেই। তবু কোথায় যেন রঘু একটা মিল খুঁজে পেল ! জিজ্ঞাসা করল – "এখন কেমন আছেন, মাসীমা ?"

– "ভালো, এখন ব্যাথাটা একটু কম !" অঙ্কিতের মা উত্তর দেয়। তারপর কিঞ্চিত আফ্‌শোষের সুরে বলে ওঠে – "তুমি প্রথম বার এলে, অথচ এক কাপ চা-ও করে দিতে পারলাম না ! অঙ্কিতের উপর দিয়ে যা যাচ্ছে ! ছেলেটা স্কুলেও যেতে পারেনি দু'দিন।"

অঙ্কিত মাকে থামিয়ে দিয়ে বলে – "আবার শুরু কররলে তুমি ?" আঁচলের কোনায় চোখ মুছে মহিলা বলল – "তুমি এসেছ, খুব ভালো লাগল !" ফুলঝুরি এতক্ষণ চোখ বড় করে সবার কথা শুনছিল। এবার বলে উঠল – "তুমিই রঘুনাথ ? দাদাকে তুমি অংক শেখাও ?" অঙ্কিত অপ্রস্তুত হয়ে বোনকে ধমকে উঠল – "ফুলঝুরি, ওটা কি রকম কথা ? রঘুনাথ দাদা বল।"

রঘু হেসে ফেলল – "তোমার দাদাকে আমি অংক শেখাই না। আমরা একসাথে পড়াশোনা করি !"

ফুলঝুরি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অঙ্কিত ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে – "মা, তুমি এখন বিশ্রাম কর !" এরপর রঘুকে বলে – "চল, আমরা ও'ঘরে গিয়ে বসি।"

অঙ্কিতদের বাড়িতে দুটোই ঘর। বাইরের ঘরটায় একটা তক্তপোষ, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা শেল্ফ ভর্তি বই খাতা আছে। বোঝাই যায়, অঙ্কিত এই ঘরেই থাকে। ভিতরের ঘরটা আয়তনে একটু বড়। ওখানে সাদা-মাটা একটা

বড় খাট, একটা আলমারি, কিছু বাক্স-প্যাট্রা ইত্যাদির সাথে একটা সেলাই মেশিনও আছে ! ঘর দুটো বাদে, বাড়ির ভিতর দিকে এক ফালি বারান্দা আর একটা উঠোনও রয়েছে। উঠোনের এক দিকে রান্নাঘর আর কলঘর।

পুরো বাড়িটা এক নজর দেখে নিয়ে রঘু অঙ্কিতকে প্রশ্ন করল – "তোর বাবা এখনও আসেনি ?" মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর দিল অঙ্কিত – "না!"

– "হ্যাঁ রে, কতটা কেটেছে ?"

– "অনেকটাই !" অঙ্কিত বলল। "বেশ কয়েকটা সেলাই পড়েছে !"

– "কিন্তু এভাবে কাটলো কি করে ?"

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে অঙ্কিত নিজেকে একটু সামলে নিল। তারপর মার ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল – "পড়ে গিয়েছিল। পড়ার সময় খাটের কোণায় লেগে মাথায় চোট পেয়েছে !" এবার সে রঘুর দিকে ফিরল – "রঘু, তুই কি চা খাবি ? আমি একটু রান্না ঘরে যাব। মাকে খেতে দেবো !"

রঘু মাথা নাড়ল – "না রে ,আমি চা খাবো না। এখন আমি বাড়ি যাব। রাত অনেক হয়েছে। তুই মাসীমাকে খেতে দে। আমি এবার চলি !"

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ৬

দুপুর সাড়ে বারোটা। ধর্মতলার মোড়ে CESC-র প্রধান দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউস-এর সামনেটা এখন মহাব্যস্ত। এই সময় এই জায়গাটা গমগম করতে থাকে গাড়ির ছোটাছুটি আর মানুষের দ্রুত, কেজো পদচারণায়। এই মুহূর্তে ঠিক সেটাই ঘটছে। দুটি একই রুটের মিনি বাস সমস্ত নিয়মকানুনকে অবলীলায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রবল রেষারেষি করতে-করতে এসে দাঁড়ালো বাড়িটির সামনের বাস স্টপেজে। বাস দুটি থেকে কন্ডাক্টর দুজন নেমে এসে এমন হাঁকাহাঁকি করে লোক ডাকতে লাগলো যেন এখুনি ভয়ানক কিছু ঘটে যাবে তাদের জীবনে একে অপরকে টপকে বেশী লোক না তুলতে পারলে। ফুটপাতে দাঁড়ানো মিঠুনের কায়দায় চুল ছাঁটা একটি যুবক তার সঙ্গীকে অশ্লীল একটি কথা বলে উঠল। দেখলেই বোঝা যায় মা সরস্বতীর সঙ্গে দীর্ঘদিন আগেই আড়ি করে ফেলেছে দুজনে। ঠিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নীল। অসহিষ্ণু ভাবে ঘড়ি দেখল সে, গত দশ মিনিটে এই নিয়ে সাতবার।

– "আশ্চর্য্য! মেয়েটা এখনও এলোনা তো ! বারোটায় আসার কথা। এর কি কোন সময়জ্ঞান নেই নাকি ?" – মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল নীল। আর কতক্ষণ দাঁড়াবে সে ? সরোজ স্যার তো বলেছিলেন দুপুর দুপুর দেখা সেরে নিতে। বেশী দেরী হয়ে গেলে যদি চলে যান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ? নাঃ, আর পাঁচ মিনিট দেখবে নীল। তারমধ্যে মেয়েটি না এলে একাই চলে যাবে সে আনন্দবাজার অফিসে।

শেষ অবধি পৌনে একটায় একাই পা বাড়ালো নীল প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে। একতলায় রিসেপশনে বসে রয়েছেন এক সুন্দরী সুবেশা মহিলা ও একটি টাকমাথা মধ্যবয়স্ক পুরুষ। মহিলাটি কথা বলছেন একজনের সঙ্গে দেখে টাকমাথা পুরুষটির সামনে দাঁড়ালো নীল।

– "বলুন", ঈষৎ খেঁকুরে গলা থেকে উঠে এলো প্রশ্নটা। – "আমি, মানে, আসলে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই"।

– "হবেনা"। – নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর আসে।

– "দেখুন, আমার কাছে ওনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চিঠি আছে। আপনি ওনাকে বলুন যে ওনার বন্ধু সরোজ উপাধ্যায় পাঠিয়েছেন আমাকে"।

– "লাভ নেই, উনি নেই কলকাতায়"।

– "নেই ?", থমকে প্রশ্ন করে নীল।

"না, কাল রাতে আমেরিকা চলে গেছেন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। পনের দিন পরে ফিরবেন। তারপর খোঁজ করুন।"

মনটা এক নিমেষে দমে যায় নীলের, মুখের আলো নিভে আসে। যাঃ! দেখা হবেনা ! উনি নেই ! এতদিনের স্বপ্ন জড়ো করে করে আজকের মুহূর্তটা এসেছিল আর ...।

পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় নীল। পা বাড়ায় উত্তর দিকে। কলেজ স্ট্রীটে যাবে একবার সে। একটা বই কেনা দরকার। কিছুতেই আসা হচ্ছিলনা। আজ বরং কিনে নেওয়া যাবে।

যোগাযোগ ভবনের পাশের রাস্তায় পা রাখতেই চোখে পড়ল, হনহনিয়ে উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে জয়।

– "কি খবর নেতাবাবু, এখানে কি করছো ?" – জয় স্বভাবচিত ভঙ্গিতে ছোঁড়ে প্রশ্নটা।

নীল হেসে ফেলে। সে বোঝে গতকাল কলেজের আন্দোলনে তার ভূমিকার নতুন এক নাম দিয়েছে জয়।

– "এই একটু কলেজ স্ট্রীটে যাচ্ছি রে" – জবাব দেয় সে।

– "তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল নীল"।

– "কোথায়"? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে নীল।

– "মহাকরণ। বুঝলি, মহাকরণ নিয়ে যাবো তোকে। আরে, আজ আমাদের পার্টির মহাকরণ অভিযান আছে বেলা একটা থেকে। শাসক দলের লাগামছাড়া অত্যাচার ও মস্তানির প্রতিবাদে। চল, তুইও চল"।

– "তুই নকশাল করিস ?" বিস্মিত হয় নীল।

– "হ্যাঁরে শালা, চমকে গেলি যে ! কেন, নকশালরা কি বাঘ না ভাল্লুক ?"

– "না, তাদের রাজনীতি তো খুনের রাজনীতি। শুনেছি ..."

– "শুনেছিস, জানিস নি, পড়িস নি", কথার মাঝে বলে ওঠে জয়, "তোকে কিছু বই দেবো, আমাদের ম্যানিফেস্টোও। পড়িস, তারপর বলিস। এখন চ তাড়াতাড়ি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাট না বকে। দেরী হয়ে যাচ্ছে"।

– "কিন্তু, আমি সেখানে গিয়ে কি করব জয় ?"

– "প্রতিবাদ করবি নীল, অন্যায়ের প্রতিবাদে অংশ নিবি। আর দেখবি, তোরই বয়সী কয়েকশো ছেলেমেয়ে কেমন বুক চিতিয়ে লড়ছে শাসকের শোষণযন্ত্রের মুখোমুখি। চ"। – নীলের হাত ধরে টান দেয় জয়।

নীলের হঠাৎ উৎসাহ এসে যায়। ভাবে, দেখেই আসি না ব্যাপারটা। জয়ের সঙ্গে জোরে পা চালায় সেও।

* *

মুখে রোদের ঝলক এসে লাগতেই তন্দ্রাটা ভেঙ্গে যায় শিঞ্জিনীর। উঠে বসতে গিয়েই আবার শুয়ে পড়ে সে। উফ, মাথাটা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাছে যেন তার। সারা দেহে অসম্ভব ব্যথা। মুখটাও বিস্বাদ হয়ে আছে। শিঞ্জিনী অনুভব করে তার গায়ে খুব জ্বর। চোখটা আবার খুলতে যেতেই তীব্র জ্বালা করে ওঠে। ধীরে ধীরে চোখ বুঝে ফেলে শিঞ্জিনী। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। হা, ঈশ্বর ! যে ভয় পাচ্ছিল তাই হল। ধুম জ্বর এসে গেছে তার। এখন কি করবে শিঞ্জিনী ? আজ তো তার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। নীল নামের সেই গভীর চোখের ছেলেটি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে আজ বেলা বারোটায়। কিন্তু মা যেই জানতে পারবে যে তার জ্বর হয়েছে, কিছুতেই যেতে দেবেনা এই অবস্থায়। অথচ শিঞ্জিনী ভাবতেও পারছেনা যে এতো বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে তার। মনস্থির করে ফেলে শিঞ্জিনী। না, মাকে কিছু বলবে না সে। একটা প্যারাসিটামল খেলেই জ্বর নেমে যাবে, তাহলে ঠিক চলে যেতে পারবে। একটু শুয়ে ধাতস্থ হয়ে নিল শিঞ্জিনী। তারপর দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল মা কোথায়। শাঁখের আওয়াজ ! তার মানে মা ঠাকুর ঘরে। দ্রুতপদে ফ্রিজের কাছে গিয়ে ঔষধের বাক্সটা হাতড়াতে থাকে শিঞ্জিনী। হ্যাঁ, এই তো প্যারাসিটামল। দ্রুত একটা জল দিয়ে গিলে আবার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে সে। আগে জ্বরটা ছাড়া দরকার, নাহলে ধরা পড়ে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘাম শুরু হতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে শিঞ্জিনী। যাক, জ্বরটা যাচ্ছে আপাততঃ।

এবার ধীরে ধীরে বিছানা থেকে ওঠে সে। বাথরুমের দিকে এগোয়। আজ একেবারে দাঁত মাজা, স্নান সেরে নেবে সে, জ্বরটা কম থাকতে থাকতে। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায় তার বাথরুমের দরজাটা টপকাতে।দ্রুত সামলে নেয় শিঞ্জিনী। আড়চোখে দেখে, মা ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসছে। বিপত্তিটা বাঁধে স্নানের সময়। গায়ে ঠাণ্ডা জল পড়তেই কাঁপুনি টের পায় শিঞ্জিনী। হি হি করে কাঁপতে থাকে সে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছেনা সে আর। জ্বরটা ফিরছে, স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে। কোনওরকমে গায়ে ম্যাক্সিটা চড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোতেই মাথা টলে যায় আবার। মাটিতে বসে পড়ে শিঞ্জিনী।

– "কি হল?", একরাশ উদ্বেগে ছুটে আসেন উমা, "মামনি কি হয়েছে তোর ?"

গায়ে হাত দিতেই ব্যাপারটা টের পেয়ে যান উমা। ইশ, মেয়ের গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। শিঞ্জিনীকে কোনওরকমে ধরে ধরে তার বিছানায় শুয়ে দেন উমা। তারপর চলে যান বিমলকে খবরটা দিতে।

শিঞ্জিনীর ঘোর যখন কাটলো তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। আলতো চোখ মেলতে মেলতেই অনুভব করে মা মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন।

– "কটা বাজে মা ?" প্রশ্ন করে সে।

– "এই তো, সাড়ে এগারোটা বাজল"।

দু' চোখ ফেটে জল আসে শিঞ্জিনীর। নাঃ, সে পারলনা। যেতে পারলনা সে। সুনীলের সঙ্গে দেখা হলনা তার। তার স্বপ্ন ভেঙে চুর চুর হয়ে গেল।

– "ছিঃ, কাঁদে না মা, জ্বর হয়েছে তো কি, সেরে যাবে"। সস্নেহে বলেন উমা।

উমার কোলে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে ফেলে শিঞ্জিনী। উমা অবাক হয়ে যান ভেবে যে সামান্য জ্বরে তার শক্ত মনের মেয়ে এতো কান্নাকাটি করছে কেন !

শেষ বিকেলে শরীরটা একটু ধাতস্থ লাগে শিঞ্জিনীর। সারা দুপুরটা খুব বাজে কেটেছে তার। জ্বর তো ছিলই, তার উপর মন আনচান করে গেছে সমানে। কি হল ওদিকে কে জানে ! নিশ্চয় নীল ছেলেটা সুনীলের সঙ্গে দেখা করে ফেলেছে। ওফ, সেই পারলনা। নীল নিশ্চয় তার উপর খুব বিরক্ত হয়েছে, তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনা ভেবেছে। নাঃ, ছেলেটার সঙ্গে একবার যোগাযোগ হওয়া দরকার। কেন সে যেতে পারেনি, সেটা জানানো প্রয়োজন। তাছাড়া সুনীলের সঙ্গে দেখা হল কিভাবে, কি বললেন সুনীল, এগুলো জানবারও অদম্য একটা ইচ্ছা কাজ করছে তার মনে।

কিন্তু নীলের ফোন নম্বর তো জানেনা সে। ও হো, সরোজ স্যার জানতে পারেন। হাত বাড়িয়ে কর্ডলেস ফোনটা টেনে নেয় নিজের কাছে শিঞ্জিনী। ডায়েরি দেখে নম্বর ঘোরাতে স্যার কে পেয়ে যায় শিঞ্জিনী আর স্যারের থেকে নীলের নম্বরও। এখনই করবে কি ? নাঃ, আরেকটু সন্ধ্যা হোক। হয়তো এখনও ফেরেনি। সন্ধ্যায় নিশ্চয় ফিরে আসবে। জানলার দিকে চোখ ফেরায় শিঞ্জিনী। বাইরের আলো দেখে বুঝতে পারে গোধূলি তার লাজুক রং ছড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে। আকাশ যেন উন্মত্ত প্রেমিকের মত চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে প্রিয়তমা পৃথিবীর দেহ। তার ঘরের জানালার কিছুদূরে একটা পেয়ারা গাছ আছে। সেখানে বসে শিষ দিচ্ছে হলুদ রঙের অজানা একটা পাখি। নষ্ট হয়ে যেতে যেতেও কলকাতা শহর তাহলে আজও এমন সুন্দর একটা পাখির আশ্রয়স্থল ! ক্লান্তিতে চোখ বোজে শিঞ্জিনী। বোঝবার আগেই ঘুম নেমে আসে তার অসুস্থ শরীরের চোখে।

ঘুম ভাঙতেই সচকিত হয়ে ওঠে শিঞ্জিনী। ঘড়ির দিকে তাকায় দ্রুত। আটটা বেজে গেছে। ইস, অনেক দেরী হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি নম্বরটা ঘোরায় শিঞ্জিনী। রিং হচ্ছে।

– "হ্যালো", এক ভদ্রমহিলার ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বর কানে আসে শিঞ্জিনীর।

একটু থমকে প্রশ্নটা করে শিঞ্জিনী, "নীল আছে?"

– "না, ও তো এখনও বাড়ি ফেরেনি। কোনওদিন এতো দেরী তো করেনা। আজ তো কি কাজ ছিল বলে কলেজেও যায় নি। কিছুই বুঝতে পারছিনা। কোনও খবরও দেয়নি। তুমি কিছু জানো? তুমি কে বলছো?"

– "না, জানিনা। আমি শিঞ্জিনী। আচ্ছা, রাখছি"। – ফোনটা নামিয়ে রাখে শিঞ্জিনী।

যাঃ, কোনও খবরই পাওয়া গেল না। শিঞ্জিনীর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে খাটের পাশের টেবিল থেকে সুনীলের "সেই সময়" উপন্যাসটি টেনে নেয় সে। খুলে ধরে চোখের সামনে।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

সুজয় দত্ত

প্রতারক

(পুষ্পা সাক্সেনার গল্পের অনুবাদ)

"হ্যালো" – ফোনের রিংটোনটা বেজে উঠতেই ফোন কানে লাগালো শীতল। "কী, 'থ্রি ইডিয়টস' ছবিটা কেমন দেখলেন? সিনেমাটা পুরোনো হয়ে গেল, তবু তার প্রতি আপনার আকর্ষণ গেল না। কতবার দেখা হল এই নিয়ে ?" ওপ্রান্ত থেকে হালকা হাসি ভেসে এল। "হ্যালো, আপনি কে কথা বলছেন ?" শীতল চিনতে পারে না গলাটা। "ধরে নিন আরেকজন ইডিয়ট-ই প্রশ্নটা করছে।" অপরপ্রান্তে আবার হাসি। "দেখুন, হয় আপনার নাম বলুন, নয়তো আমি ফোন রেখে দিচ্ছি। দুনিয়ায় ইডিয়ট কম নেই। তার মধ্যে থেকে আপনাকে চিনব কী করে ?"

"না না না, একদম ওই ভুলটি করবেন না। আচ্ছা, আমি যে প্রশ্নটা করলাম তার জবাব দিলেন না তো ?"

"তোমার আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো ফালতু সময় আমার নেই, ইডিয়ট কোথাকার !" বলে শীতল ফোনটা বন্ধ করার আগেই ওদিক থেকে শোনা গেল, "সরি ম্যাডাম, ভুল করছেন। জিনিয়াস ইডিয়ট বলা উচিত। দেখছেন কত সহজে আপনার মোবাইল নম্বর কব্জা করে ফেলেছি ?"

"এতে বাহাদুরির কী আছে ? তোমার মতো নিষ্কর্মা ছেলেদের ওটাই তো কাজ। বন্ধুমহলে তারিফ পেতে মেয়েদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর জোগাড় করে তাদের এইভাবে বিরক্ত করা। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি – দ্বিতীয়বার যদি ফোন করেছ, আমি সোজা পুলিশে রিপোর্ট করব। মজা টের পাবে তখন।" রেগে ফোনটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে শীতল। এম এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী শীতল লাবণ্য আর মেধা – দুই ধনেই ধনী। এমন নয় যে ছেলেছোকরারা ওকে দেখে টুকরোটাকরা মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় না বা বাড়ী ফেরার সময় ওর পিছু নেয় না, কিন্তু মেয়েটার একটা গাম্ভীর্যের কবচ আছে যা ওসব জিনিসকে একদম বাড়তে দেয় না। ওকে নিজের করে পাবার বা ওর সঙ্গে সময় কাটাবার স্বপ্ন মনে মনে লালন করে – এমন যুবকের সংখ্যা কম নয়। তবে আজ অবধি কেউ এরকম ফোন করার সাহস দেখায়নি। মা-বাবার একমাত্র সন্তান ও, তাঁদের আদরযত্নে মানুষ, তবু মনের সব কথা তো আর তাঁদের খুলে বলা যায় না। সেটার জন্য আছে প্রিয় বান্ধবী পূজা। ওদের পারস্পরিক বোঝাপড়া দারুণ। আজ যখন শীতল থমথমে মুখে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছে, পূজা একঝলক দেখেই বুঝে গেল তার বন্ধুকে ঠিক "শীতল" লাগছে না, তার পারদ চড়ে আছে। সে হেসে জানতে চাইল, "কী ব্যাপার ? অমন ফর্সা মুখ আজ কালো লাগছে কেন ?"

"দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায় কী করে সিধে করতে হয়। নিজেকে হিরো ভাবো, না ? আবার রগড় হচ্ছে – 'জিনিয়াস ইডিয়ট' ? সাহস থাকে তো সামনে এসে বল না – জিনিয়াসগিরি বের করে দেব।"

"কার কথা বলছিস ? কাকে সিধে করবি ?" পূজা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। "ছিল কেউ একটা। নাম বলার হিম্মত নেই। কে জানে কোথা থেকে খবর পেয়েছে আমি 'থ্রি ইডিয়টস' দেখতে গিয়েছিলাম ! ফোন করে জিজ্ঞেস করছে সিনেমা কেমন লাগলো।"

"ব্যস, তাতেই এতো রাগ ? বলে দিলে পারতিস – ফিল্ম ভালো লাগুক না লাগুক তাতে তোমার কী বাছাধন ? যাকগে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে ও জানল কোথা থেকে ? দেখ, তোরই কোনো এডমায়ারার হবে – হয়তো সিনেমাহলে দেখেছে তোকে। কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপারে এতো রেগে যাওয়া তো ভালো নয়, মাই ডিয়ার। হায়রে, আমায় যদি কেউ ফোন করে একটু ফ্লার্ট করতো ! কী আর করা যাবে – ভগবান যত সৌন্দর্য সব তোকেই দিয়েছেন।" পূজার মুখে দুষ্টুমিভরা হাসি। "ঠিক আছে,

জানা রইল। এবার আমায় কেউ ফোন করলে তোর নম্বরটা দিয়ে দেব। এখন ক্লাসে যাবি, না আজও আবার কফি খাবার জন্য ক্লাস কাটবি ?"

"আমার কি আর এমন সৌভাগ্য আছে যে তুই আমার সেই গর্হিত কাজের সঙ্গী হবি? অগত্যা আবার ক্লাসে গিয়ে সেই একঘেয়ে লেকচার মুখ বুজে সইতে হবে। দূর, কেন মরতে এই হিস্ট্রি অনার্স নিয়েছি বলতে পারিস ? রোজ রোজ অতীতের কবর খোঁড়া, মুখস্থ করা আর ওগরানো।"

"তোর এই চিন্তাধারাটাই ভুল, পূজা", বন্ধুর অনিচ্ছা-ভরা চেহারা দেখে হেসে বলে শীতল, "একটু ভালোবেসে, মন দিয়ে পড়লে ইতিহাস থেকে কত রোমান্স আর থ্রিল পাওয়া যায় জানিস ? চল, এবার সত্যি দেরী হয়ে যাচ্ছে।" ব্যাজার মুখে ক্লাসের দিকে হাঁটা লাগায় পূজা। সে-রাতে মোবাইল বাজার শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙল শীতলের। মনে একটা সুতীব্র আশংকা জাগলো ওর – বাড়ী থেকে কেউ ফোন করেনি তো ? যেদিন থেকে ও উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ী ছেড়ে এই নতুন শহরে এসেছে, মনে সবসময়েই মা-বাবার জন্য একটা চিন্তা থাকে। প্রথম দিকে তো একা একা হোস্টেলে থাকতে একদম ভালো লাগতো না। এখন পূজার সঙ্গে বন্ধুত্ব আর ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় বাড়ীর জন্য মন কেমন করাটা কমেছে। "পিছনের জানলার পর্দাটা একটু তুলে দেখুন ! মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আহা, কী দৃশ্য ! প্লীজ এ-জিনিস মিস করবেন না – আমি অনুরোধ করছি।" আবার সেই সকালের গলা। "পাগল না মাথাখারাপ যে রাত দুটোর সময় বাইরের দৃশ্য দেখব ? রাত জেগে ওসব করা তোমার মতো বেহায়া বেল্লিকেরই সাজে। মনে হচ্ছে তুমি নিজে থেকে ঠিক হবে না, আমাকে বাধ্য হয়ে অ্যাকশন নিতে হবে।" বলে ও ফোন বন্ধ করে দিলো ঠিকই, কিন্তু মনে মনে প্রশ্নটা রয়েই গেল – এমন কী দেখাতে চাইছিল ছেলেটা যে এই গভীর রাতে ওকে ঘুম থেকে জাগাতে হলো ? বালিশ থেকে মাথা তুলে মাথার কাছের জানলার পাতলা পর্দা দিয়ে বাইরে একবার তাকাবার লোভ সামলাতে পারে না ও। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে বাইরেটা, গাছপালাগুলো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না-স্নান করছে। মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে খিড়কী দরজার পাশে দাঁড়ালো আরো ভালো করে দেখবে বলে। ওর অন্তরের কবিসত্ত্বা জেগে উঠলো। কবিতার কয়েকটা লাইন সবে মনে মনে সাজিয়েছে, আবার মোবাইলের ঝনঝনানি। "বিশ্বাস হলো তো, কেমন অপূর্ব দৃশ্য ? দেখে নিশ্চয়ই কবিতা-টবিতা আসছে মাথায় ? এলে কিন্তু কৃতিত্বটা আমার", আবার সেই হাসি। "কতজনের ঘুমের বারোটা বাজিয়েছো এখনো অবধি ? তোমার নম্বর কিন্তু আমার মোবাইলে এসে গেছে। এবার ব্যবস্থা করছি তোমার।"

"তাই নাকি ! অবাক করলেন আপনি। বলেছিলাম না আমি জিনিয়াস ? আমায় যদি কোনোদিন ধরতে পারেন, যা শাস্তি দেবেন খুশি হয়ে নেবো। এমনিতেই কাল আকাশ-নীল সালোয়ার-কামিজে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিলো নীল আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে। আচ্ছা, আপনার প্রিয় রং কোনটা বলুন তো ? না বললে কিন্তু আমি ঠিক জেনে নেবো। যাকগে, এতক্ষণ ধরে আমার কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।" কেটে গেল ফোন। আবার বিছানায় গিয়ে শোয় শীতল, কিন্তু ঘুম আর আসে না। হঠাৎ এমন ভুল করে বসলো কেন ও – একজন অজানা অচেনা লোকের ফোন সঙ্গে সঙ্গে কেটে না দিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলতে গেলো কেন ? লোকটা ওর জামাকাপড়েরও খবর রাখে। খুব সম্ভবতঃ ওর হোস্টেলেরই আশপাশে ঘুরঘুর করা কোনো বখাটে বেকার। কাল ওর ফোন নম্বর দিয়ে ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। অনেকবার এপাশ-ওপাশ করার পর শেষরাতে ওর ঘুম এলো। কিন্তু সাতসকালে মায়ের ফোনে আবার তা ভেঙেও গেলো।

"কী হলো মা ? এতো সকালে ? বাড়ীর সব ঠিকঠাক আছে তো ?"

"সব ঠিক আছে। তুই উঠিসনি এখনো ? তোর সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।"

"কী ব্যাপার ?"

"দেখ, কিছুদিনের মধ্যে ইন্দ্রনীল বলে একটা ছেলে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওর সঙ্গে ভালোভাবে কথাবার্তা

বলিস, কেমন? ওর সম্বন্ধে যা যা জানতে চাস, সব জেনে নিস্‌। বিরক্তি-টিরক্তি বা মেজাজ-টেজাজ দেখিয়ে ফেলিস না যেন।"

"কেন, তোমার কি ধারণা আমি লোকজনের সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলতে শিখিনি ? আচ্ছা, এই ছেলেটা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে কেন ? তুমি আবার আমার বিয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করোনি তো ? আমি কিন্তু এখন বিয়ে-টিয়ে করতে পারবো না।"

"ব্যাস ব্যাস, অনেক পাকামি হয়েছে। তুই নিজেই বলেছিলি পড়াশোনা শেষ হলে তবে বিয়ে করবি। তোর এম এ ফাইনাল তো আর দুমাস বাদেই শেষ। এবার যদি আমার কথা না শুনিস, আমি কিন্তু তোর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেব বলে দিলাম।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। ওঃ। তা, তোমার এই ইন্দ্রনীল ঠিক কেমন চীজ ?"

"আরে, ও তো হীরের টুকরো ছেলে। ওকে ভালো না বেসে পারা যায়না। এমন করে আমার সঙ্গে মেশে যেন কত বছরের চেনা। আর সবাইকে খালি হাসাবে। অস্ট্রেলিয়ার একটা বড় কোম্পানীতে সফটওয়্যার এঞ্জিনীয়ারের চাকরি নিয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে ওর মা চান ও বিয়ে করুক। ওর সঙ্গে পরিচয় হোক, নিজেই দেখিস আমি সত্যি বলছি কিনা।"

"তার মানে ওর মা ভয় পাচ্ছে ও কোনো অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে বিয়ে না করে ফেলে।"

"আবার বাজে বকা শুরু করলি ? এটা জেনে রাখ, তুই যদি আমার এই কথাটা না শুনিস, আমিও ভবিষ্যতে তোর কোনো কথা শুনবো না।" এবার মা-র গলায় বকুনির আভাস। "ঠিক আছে বাবা, চিন্তা নেই। আমি তোমার ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দেখা করব আর কোনো উল্টোপাল্টা ব্যবহারও করবো না। এবার খুশী ? আচ্ছা, ই-ন্দ্র-নী-ল – এতো বড় নাম না হয়ে একটু ছোট হতে পারতো না ?"

"সে তুই বিয়ের পর ওকে যাখুশি নামে ডাকিস, আমার কিছু বলার থাকবে না। যা, এবার তোর কলেজের সময় হয়ে আসছে, তৈরী হ। আমার কথাগুলো খেয়াল রাখিস।"

"তোমার কথা খেয়াল রাখিনি এমন হয়েছে কোনোদিন ? বাবাকে আমার প্রণাম দিও।"

ফোন রেখে তৈরী হতে বাথরুমে ঢোকে ও। কে এই ইন্দ্রনীল, যে মাকে এভাবে জয় করে নিয়েছে ? এমনিতে ওর বিয়ে করার সত্যিই কোনো তাড়া নেই, কিন্তু মা যা বলল সেসব শুনে মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগছে – একবার দেখেই নেওয়া যাক কে এই মনমোহন ব্যক্তিটি। ব্যাপারটা পূজার সঙ্গেও একবার আলোচনা করা দরকার, এইসব ভাবতে ভাবতে রওনা দেয় ও। মা-র ফোনের জন্য বেরোতে একটু দেরীই হয়ে গেলো আজ, ক্লাসের আগে পূজার সঙ্গে ক্যান্টিনে আর দেখা করা হবেনা। ও বেচারা হয়তো শীতলের জন্য অপেক্ষা করছে ওখানে। "কিরে, আজ ক্যান্টিনে এলি না যে ? তোর সেই নতুন প্রেমিকের ফোন এসেছিল বুঝি ?" দেখা হতেই হাসতে হাসতে শীতলকে জিজ্ঞেস করলো ও। "এসেছিলো, তবে রাত দুটোয়। আমায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখাতে। তবে সত্যিই সেই দৃশ্যটা খুব সুন্দর ছিল। না দেখলে খুবই আফসোস হতো, মিস করতাম। মনে হচ্ছে মশাইয়ের একটু কবিতা-টবিতার শখও আছে। আমার সম্বন্ধে দেখছি অনেক কিছু জানে, এমনকী এটাও যে আমি কবিতা লিখি।"

"তবে আর কী, মনের মতো প্রেমিকই তো পেয়েছিস শীতল !"

"সাচ্চা প্রেমিকের তো নিজের নামঠিকানা লুকোবার দরকার পড়ে না রে। একটা কথা অবশ্য সত্যি যে লোকটার অনুমান-ক্ষমতা খুব প্রখর। কে জানে লুকিয়ে লুকিয়ে কোথা থেকে বা কার কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে এতো খবর পায়। এতটাই যে আমি কী রঙের জামাকাপড় পরি সেটাও ওর মনে থাকে।"

"ঝেড়ে কাশ তো শীতল – তুই ওর সঙ্গে কথা বলা এনজয় করিস, না করিস না ?"

"ও যখন ফোন করে, তখন তো রাগ হয়। কিন্তু পরে কথাগুলো মনে পড়লে খুব হাসি পায়। তাছাড়া ও আজ অবধি কখনো কোনো অশ্লীল কথা বলে নি – রাস্তার বখাটে ছেলেরা যেটা হামেশাই করে।"

"নাঃ, আমার তো লোকটাকে সাচ্চা প্রেমিকই মনে হচ্ছে। সামলে-সুমলে থাকিস ভাই।"

"আরে দূর, আমার কি মাথাখারাপ হয়েছে নাকি ? ছাড় ওসব কথা। আজ মা-র ফোন এসেছিল। কী বললো জানিস ? আমার বিয়ের জন্য আমাকে নাকি একজন দেখতে আসছে। বুঝতে পারছি না ঠিক কী করা উচিত। জানিনা মা-বাবারা তাদের মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি পারে বিদায় করতে চায় কেন।"

"বাঃ, এ তো দারুণ খবর। কে সেই ভাগ্যবান যে আমাদের শীতলের হাত ধরতে চলেছে ? ইস, আমার বিয়েটা যদি এই কলেজে আসার আগেই ঠিক হয়ে না গিয়ে থাকতো –"

"কেন ? নীতীন সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ আছে বুঝি ? নাকি অন্য কাউকে পছন্দ হয়েছে মনে মনে ?" শীতল ঠাট্টা করে। "আরে না না, নীতীন তো খুবই ভালো ছেলে। আসলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় আমি লাভ ম্যারেজ করি। বিয়ের আগের রোমান্সের মজাই আলাদা।"

"প্রেমটা নাহয় বিয়ের পরেই করলি। এ-দেশে আর কটা মেয়ে লাভ ম্যারেজ করার অনুমতি পায় ? কোনো না কোনো অজুহাতে কেউ না কেউ এসে প্রেমের বন্ধন ঠিক ছিঁড়ে দেয়। আমার একটা কথা রাখবি পূজা – প্লীজ ? ওই ইন্দ্রনীল ছেলেটা যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তুই আমার সঙ্গে থাকবি ?"

"না বাবা, আমি কেন খামোখা 'কাবাব মে হাড্ডি' হতে যাব ? আর কলেজের সব ডিবেট প্রতিযোগিতায় যে জেতে, সেই শীতল একটা ছেলেকে ভয় পেয়ে শিখন্ডী চাইছে – এ আবার হয় নাকি ? চল, আজ এই সুখবরের অনারে ক্লাস কাটি দুজনে। চাট খাবি ?"

"ঠিক আছে, আজ ইন্দ্রনীলের অনারে তোর কথাই শুনব।"

সেই সন্ধ্যায় শীতল হোস্টেলের ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মোবাইল বাজল। "ক্লাস কাটা তো ভালো অভ্যেস নয়। বিশেষ করে আপনার মতো মেয়ের কাছে তো এ-জিনিস কখনোই আশা করা যায় না। কী, কোনো দারুণ খুশ-খবর উদযাপন করার ব্যাপার ছিল নাকি ?"

"দ্য হেল উইথ ইউ। আমি কী করবো না করবো, কোথায় যাবো না যাবো তাতে তোমার কী ? আমাকে এভাবে জ্বালাচ্ছ কেন বল তো ? কেন সামনে আসছো না ?" রেগে যায় শীতল। "সরি, আপনাকে জ্বালানো আমার উদ্দেশ্য ছিলনা।" বলেই ফোন কেটে দিলো ছেলেটা। শীতল ওর মোবাইলে ছেলেটার যে নম্বর উঠেছে তাই দিয়ে ওর খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেখলো প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা ফোন বুথ থেকে ফোন করা হয়েছে। ঠিকই বলেছিল ও – ওকে ধরা বেশ কঠিন। বলিউডি সিনেমায় এক ধরণের 'রোমিও' থাকে যারা পাগলের মতো একটা মেয়ের পিছনে পড়ে থেকে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। শীতলের মাঝে মাঝে মনে হয় এই ছেলেটাও ঐরকম, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে কই – ওর কথাবার্তা তো ঠিক পাগল-দিওয়ানা টাইপ নয় ! বরং বেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা।

"আপনার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এসেছেন। ভিজিটিং রুমে বসে আছেন।" হোস্টেলের পরিচারিকা এসে খবর দিলো। "আচ্ছা, আমি আসছি।" বলে শীতল প্রথমেই তাকাল নিজের পোশাকের দিকে। এখন তো আর চেঞ্জ করার সময় নেই। এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রনীল। হাত দিয়ে চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে ও ভিজিটিং রুমের দিকে হাঁটা লাগলো। সেখানে

এক সৌম্যদর্শন যুবক অপেক্ষা করছিল। শীতলকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। একনজর দেখেই শীতলের বুঝতে বাকী রইল না কেন এই ছেলেটার ব্যক্তিত্বে সবাই এতো প্রভাবিত হয়ে পড়ে। পরনে স্লেট-রঙা স্যুট আর সাদা শার্ট, পায়ে পালিশ করা জুতো – পোশাকআশাক থেকেও ব্যক্তিত্ব ঠিকরে বেরোচ্ছে। মুখে একটা মোহন হাসি লেগেই আছে। "বসুন বসুন। আমি শীতল, আর আপনি সম্ভবত ইন্দ্রনীল – তাই তো ?" যতদূর সম্ভব মিষ্টি গলায় বললো শীতল। "ও, আপনি তাহলে আমার দাদার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সরি, ওকে একটা জরুরী কাজে শহরের বাইরে যেতে হলো। ও জানতো আপনি ওর জন্য অপেক্ষা করবেন, তাই আপনাকে পছন্দ করার দায়িত্ব ও আমার ওপর দিয়ে গেছে। ও হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা দেওয়া হয়নি। আমি নীলেশ – ইন্দ্রনীলের ছোট ভাই।"

"অদ্ভুত তো! আপনার দাদা তাঁর জায়গায় আপনাকে পাঠালেন ? কেমন লোক আপনার এই সো-কলড দাদাটি ?"

"আরে ওর গুণকীর্তন করতে গেলে তো ভাষাই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ও খুব গম্ভীর, তেজস্বী, মেধাবী, রুচিবান, যোগ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি আরো যে কত কী – তা বলে শেষ করা যাবে না। আমার ওপর ওর অগাধ আস্থা। তবে আমি ওর পায়ের ধুলোর যোগ্যও নই।"

"বুঝলাম, তিনি আপনার কথা-অনুযায়ী একেবারে গুণের খনি। কিন্তু যার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাইছেন, তাকে একবার নিজের চোখে দেখাটাও জরুরী মনে করলেন না ? এ আবার কেমনধারা বিশ্বাস ? মনে হয় বিয়েতে ওঁর খুব একটা উৎসাহ নেই, তাই না ?" শীতল স্পষ্ট গলায় নিজের মতামত ব্যক্ত করে। "ও জানে যে আপনার সবরকম পরীক্ষা নিয়েই আমি আপনাদের এ-বিয়েতে মত দেব। অবশ্য একটা কথা আমি এখনই জোর দিয়ে বলতে পারি – আপনি ওর জন্য একজন খুব উপযুক্ত জীবনসাথী। ও নিজেও বোঝে সেটা।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, কী বললেন ? আপনি আমার পরীক্ষা নেবেন ? আমার পরীক্ষা নেয়ার আপনি কোথাকার কে ?" শীতলের মুখ থমথমে হয়ে আসে। "পরীক্ষা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, আর আপনি তাতে ফুলমার্কস পেয়ে পাশও করেছেন।" হাসতে হাসতে বলে ছেলেটা। এ-হাসিটা কেন যেন খুব চেনা লাগছে ? এমন হাসি আর কথা বলার ধরণ যেন কার ? আরে, এ সেই দিনরাত উড়ো ফোন করা ছেলেটার না ! শীতল ভাবে, ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের একে চিনতে এতক্ষণ লাগলো ? এখন তো আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। "তুমি – তুমি সেই লোকটা না যে আমাকে বারবার ফোন করে বিরক্ত করে ? এইসব করতে বলেছেন বুঝি তোমার ধীর, গম্ভীর, তেজস্বী দাদা ? পরিষ্কার বলে দিচ্ছি – তোমার বা তোমার দাদার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক আমি চাইনা।" রেগে লাল হয়ে ওঠে ও। "আচ্ছা, দাদার কথা ছাড়ুন, আমার সম্বন্ধে আপনার কী মত ? শুনেছিলাম আপনার নাকি খুব রাগ। সত্যি বলছি, সারাজীবন আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকব। বেশ ভালো চাকরি সেটা। আপনাকে জীবনভর সব সুখ-আহ্লাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

"সে কী ? তোমার আদরণীয়, শ্রদ্ধেয় দাদাকে কী জবাবদিহি করবে ? তোমার ওপর না তাঁর অগাধ বিশ্বাস ? সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করবে ? না হে শ্রীযুক্ত নীলেশ, তোমার দাদার মনে এতো বড় আঘাত দিতে তো আমি তোমাকে দেবোনা। সত্যি বলতে কি, আমার ওই ভদ্রলোকের প্রতি সহানুভূতি জাগছে। যে মানুষটা নিজের ভাইকে এত বিশ্বাস করে, সে তার বৌয়ের তো সাত খুন মাফ করে দেবে। এইরকম লোকের সঙ্গে তাও সম্পর্ক পাতানো চলতে পারে।"

"অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমি – আমি আরেকটু হলেই একটা বড় অপরাধ করে ফেলতে যাচ্ছিলাম। এখন আমার মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দাদাকে আপনার এই 'হ্যাঁ'-টা আমি জানিয়ে দেব।" আবার সেই ফিচেল হাসি। এবার শীতল সত্যি চটে যায়।

"থ্যাংকস। আমি তোমার দাদার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। তাঁকে বোলো আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। চলি। নমস্কার।" বলেই নীলেশকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে ও।

হাসিমুখে সোজা গিয়ে হাজির হয় পাশের হোস্টেলে পূজার ঘরে। "কিরে শীতল, তোর আলাপ আর পরিচয়পর্ব কেমন হলো ? মনে হচ্ছে কেসটা জমে গেছে !" একচোখ ঔৎসুক্য নিয়ে জানতে চায় পূজা। "আলাপ-পরিচয় ছাড়, আরও বড় খবর আছে। আজ সেই উড়ো ফোন করা ছেলেটার রহস্য সমাধান করে ফেলেছি।"

"সত্যি ? কে ও ? ওকে পুলিশে দিলিনা কেন ?"

"আরে ও তো আমার জন্য মা-র পছন্দ করা পাত্র ইন্দ্রনীল! ওর কথাবার্তায় বুঝলাম, নিজের ভাইয়ের ভেক ধরে মশাই আমার পরীক্ষা নিতে এসেছেন। আমিও মুখের মতো জবাব দিয়ে দিয়েছি। দেখি এবার আসল ইন্দ্রানীলকে কোথা থেকে জুটিয়ে আনে।"

"আরিব্বাস! তোর তো এটা 'প্রেম কাহানী' হয়ে গেলো রে। তো লাগলো কেমন তোর পাণিপ্রার্থীকে ?"

"আমি তো এটা ভেবেই খুশী যে ওকে উপযুক্ত জবাব দিতে পেরেছি। এমনিতে দেখতে সুন্দর – বেশ হিরো-হিরো চেহারা। কথাবার্তায়ও চোস্ত। কিন্তু এবারই আসল মজা। আমাকে বোকা বানাতে এসে নিজেই কিছুটা বোকা বনে গেছে।" দুষ্টুমিভরা হাসি শীতলের মুখে। "আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ও তোর মন চুরি করে নিয়েছে।" পূজাও হাসতে হাসতে বলে। "আজ্ঞে না, আমার হৃদয় অত সহজে চুরি করা যায় না। যাকগে, এখন চলি। মা-র ফোন আসতে পারে।"

ঘরে ফিরে বই খুলে বসলেও মন বসছিল না শীতলের। বারবার চোখের সামনে নীলেশের চেহারাটা ভেসে উঠছিল। ছেলেটার এখন কী রিঅ্যাকশন হবে কে জানে। নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে না তো ? যদি অন্য দিনের মতো আজও ফোন করে আর বলে, "আপনি মনটা খারাপ করে দিলেন। আমি কিন্তু অতটা বাজে লোক নই।" কিন্তু অনেক রাত অবধিও কোনো ফোন এলোনা। কাল রবিবার, অনেক বেলা করে উঠলেও অসুবিধে নেই – এই ভেবে শেষরাতের দিকে যেই শুয়েছে, মোবাইল বেজে উঠল। নিশ্চয়ই ওই ছেলেটার ফোন। কিন্তু ফোন কানে লাগিয়ে অপর প্রান্তে শীতল একটা গম্ভীর, ভারী গলা শুনতে পেল।

"হ্যালো শীতলজী, আমি জয়পুর থেকে ইন্দ্রনীল বলছি। ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি নিজে যেতে পারিনি। খুব জরুরী কাজ ছিল, কাটানো সম্ভব ছিল না। তবে আপনার সম্বন্ধে নীলেশ এতো বিস্তারিত বলেছে যে ধরে নিতে পারেন আমিই আজ গিয়েছিলাম আপনার কাছে। ও আমাকে আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। খুব শিগগিরই দেখা করতে যাবো আপনার সঙ্গে। আমার সম্বন্ধেও ও নিশ্চয়ই কিছু কথা বলেছে। আরো যদি জানতে চান, নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

"না। আপনার ভাই আপনার খুব প্রশংসা করেছে। একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি ওর ওপর এতটাই বিশ্বাস রাখেন যে নিজের জীবনসঙ্গী বাছতে ওকে পাঠিয়েছেন ? আপনি জানেন, ও আপনার বদলে নিজের সঙ্গেই আমার বিয়ের প্রস্তাব পেড়ে বসলো ?"

"আরে ওর কথা আপনি সিরিয়াসলি নেবেন না। মজা করাটাই ওর স্বভাব। যাইহোক, আপনি যে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আমাদের। নীলেশ জয়পুর থেকে আপনার পছন্দের রঙের শাড়ী নিয়ে যেতে বলেছে আমাকে। আনছি সেটা। এখান থেকে আর কিছু চাই ?"

"থ্যাংকস। আমার আর কিচ্ছু চাই না। বাই।"

ফোন বন্ধ করতে করতে শীতলের কান্না পাচ্ছিল। এটা কী হয়ে গেলো ? ফোন সত্যিই জয়পুর থেকে এসেছিল। তার মানে ইন্দ্রনীল আজ আসেনি ? তার মানে ইন্দ্রনীলকে ও দেখেননি ? তাকে সামনাসামনি না দেখে, না কথা বলে ও এই

বিয়েতে সম্মতি দিয়ে বসলো ? ঠিক সেই সময় মা-র ফোন এলো। "আজ আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেছে রে। ইন্দ্রনীলের মতো জামাই অনেক ভাগ্য করলে মেলে। ও তোর সঙ্গে দোলের পর দেখা করার অনুমতি চেয়েছে। তোর ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে যে প্রিপারেশনের ছুটি আছে, তখনই আসবে ও।"

"মা, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। আমি ইন্দ্রনীলকে বিয়ে করতে পারবো না।"

"কী পাগলের মতো বকছিস! তুই নিজেই তো সম্মতি দিলি। কেউ তো আর জবরদস্তি করেনি?"

"ও তুমি বুঝবে না মা। আমি অন্য একজনকে –"

"আমার কিছু বোঝার দরকার নেই। অনেক ছেলেখেলা হয়েছে মন নিয়ে। আচ্ছা, আমি কী তোর শত্রু, শীতল ? ইন্দ্রনীল সব দিক দিয়ে তোর উপযুক্ত। আর এই নিয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন রাখিস না মা। ছেলেমানুষি ছাড়। কাউকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আমার কথা বিশ্বাস কর, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে তুই খুব সুখে থাকবি।" ফোন ছেড়ে দিলেন মা। শীতল বুঝতে পারছিল না এখন কী করা উচিত। এ তো নিজের পায়ে কুড়ুল মারার মতো ব্যাপার হয়ে গেলো। পূজাকে জিনিসটা বলতে ও-ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। শুধু একটাই পরামর্শ দিলো – ইন্দ্রনীলকে মনের কথাটা জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু ফোন করে তো আর জানানো যাবেনা। সে জয়পুর ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ীর পথে এখন। এখন ও কবে দেখা করতে আসবে – তারই অপেক্ষা।

দেখতে দেখতে প্রিপারেশন উইকের ছুটি চলে এলো। শীতলের মনে শান্তি নেই। ইন্দ্রনীল যেকোনো দিন আসতে পারে ওর সঙ্গে দেখা করতে। ও কী ভদ্রলোকের মুখের ওপর বলতে পারবে যে তাঁকে নয়, ও তাঁর ভাইকে বিয়ে করতে চায় ? ছুটির তিন দিন কেটে যাওয়ার পর একদিন সকাল সকাল পরিচারিকা এসে জানাল "কে এক নীলবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েচেন। পুরো নামটা যেন কী বললেন, মনে পড়ছে না।"

বুক ধুকপুক করছে শীতলের। কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় করে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। গিয়ে যাকে দেখলো, একেবারে চমকে গেলো ! সেই মোহন হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলেশ। বেচারা শীতল কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন সময় নীলেশই মুখ খুললো। "তারপর, কী খবর ? চেয়েছিলাম দোলের দিন এসে আপনাকে রং মাখিয়ে দিয়ে যাব। পারলাম না আসতে। এখন শুধু চাই জীবনের সব সুখ, সব খুশী আপনাকে সর্বদা রঙীন করে রাখুক।"

"আজও কি ইন্দ্রনীলের বদলে তুমি ওঁর কাছ থেকে নতুন কোনো খবর নিয়ে এসেছো ?"

"নাঃ। আজ সে তার জায়গাটা চিরকালের জন্য আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। দাদা হয়ে ভাইয়ের জন্য এটুকু করবে না ? আসলে ও জেনে গেছে যে আপনি আমাকেই চান। আপনার পিছু নেওয়ার জন্য পুরো দশ দিন বাড়ীর বাইরে কাটিয়েছি শীতলজি। সত্যি বলুন তো, আমার ওই উড়ো ফোনগুলো আপনার খারাপ লাগতো কী ? আমার তো মনে হতো আপনি ঐগুলোর জন্য অপেক্ষা করেন।"

"তুমি ভুল করছো। কারো বিকল্প হিসেবে তোমাকে কেন গ্রহণ করতে যাব ? আমি তো ইন্দ্রনীলকে দেখা করতে আসতে বলেছিলাম, তার বিকল্পকে নয় –"

"ঠিক আছে, তাই যদি হয়, বলেই ফেলি শীতলজি – আমি কারো বিকল্প-টিকল্প নই। আমিই ইন্দ্রনীল – মা-বাবার বড় ছেলে। এবার বলুন, কী ইচ্ছে আপনার ? সরি, আমি চেষ্টা করলেও আপনার সামনে ইন্দ্রনীলের কোনো ডামি-কে হাজির করতে পারবোনা। আমার সে-সাহস নেই। যাকগে, এই নীলকে দিয়ে কি চলবে ?"

"তুমি এতো বড় প্রতারক ইন্দ্রনীল ! তোমাকে বিয়ের কথা তো ভাবতেই ভয় করছে।"

"আবার সেই ভুলটা করছো ? আমি প্রতারক নই, জিনিয়াস ইডিয়ট। বলেছিলাম না, আমাকে তুমি ধরতে পারবে না ?"

"কিন্তু ধরে তো আমি ফেলেছি। প্রথম দিনেই তো বুঝে ফেলেছিলাম তুমিই সেই উড়ো ফোনের ছেলেটা।"

"এটা তো বুঝতে পারো নি যে আমিই আসল ইন্দ্রনীল? নাহলে মাকে বলছিলে কেন, তুমি ইন্দ্রনীলকে বিয়ে করতে চাও না, অন্য কাউকে ভালোবাসো ? ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলে তো ? মাকেও শেষমেশ পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হলো, নাহলে ফোনে তোমার কথা শুনে উনিও খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।"

"মেনে নিচ্ছি ওই জায়গাটায় আমি ধোঁকা খেয়ে গেছি। তবে এটাকে আমার হার বলে ভেবোনা। আমার মাকে তুমি এমন মোহজালে জড়িয়েছো যে সেটা থেকে বেরোনো মুশকিল। নাহলে কিন্তু –"

"নাহলে কিন্তু কী ? তুমি কোনো এক বেচারা ইন্দ্রনীল – যে তার ভাইকে বিশ্বাস করে ঠকেছে – তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে ? এইরকম ভুল যে করে, তাকে তো আমার হাতে শাস্তি পেতেই হবে।" ইন্দ্রনীলের মুখে মিচকে হাসি। "আর কী শাস্তি দেবে, নীল ? এতদিন ধরে আমায় ফোন করে বিরক্ত করেছো, শাস্তি তো আমার তোমাকে দেওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যেন জানি না ভদ্রমহোদয়া ফোনের জন্য কীরকম অপেক্ষা করে থাকতেন মনে মনে।"

"এটা তোমার ভুল, নীল। সেই সময় তোমাকে ধরতে পারলে হাতে ঠিকই হাতকড়া পরাবার ব্যবস্থা করতাম।" মুখে পরিহাসের হাসি ফুটিয়ে বলে শীতল। "তা ভালোই তো, এখন পরিয়ে দাও। তবে লোহার হাতকড়া নয়, প্রেমের বন্ধন। আর কয়েক মাস বা বছরের জন্য নয়, যাবজ্জীবন।" বলেই এগিয়ে এসে শীতলের মাথায় তার প্রথম চুম্বন এঁকে দিলো ইন্দ্রনীল। আর শীতলের গোলাপী মুখে তখন সিঁদুরের আভা।

স্বর্ভানু সান্যাল

ঘোড়া

পর্ব ১১

আজকে ভাবছি ঘোড়া নিয়েই লিখব কারণ ঘোড়ার কথাই মাথায় ঘুরছে। আগেকার দিনে শুনেছি হামেশাই রাস্তাঘাটে ঘোড়া দেখা যেতো। কদাপি ঘোড়ার দেখা না মিললেও অন্তত এক নাদি ঘোড়াবর দেখা যেতো। মানে গরুর যেমন গোবর, ঘোড়ার তেমনি ঘোড়াবর আর কি! শব্দটা, হ্যাঁ, আমারই বানানো, কারণ ঘোড়ার পটিকে চলতি বাংলায় কি বলে আমার জানা নেই। ভাল বাংলায় অশ্বময় বলে হয়তো, গরুর যেমন গোময়। কিন্তু ঘোড়াময় বা গোরুময় বললে ব্যাপারটা তেমন বাঙময় হয় না। গোবর-এর মত ঘোড়াবর কথাটা সেই তুলনায় খানিকটা জব্বর বলা চলে।

কিন্তু ঘোড়া নিয়ে কথা বলতে শুরু করে প্রথমেই ঘোড়ার পটিতে চলে যাওয়াটা পাতি ভাল দেখায় না। তাই ঘোড়ার কথাই গোড়ায় বলি। যা বলছিলাম, আগে ঘোড়াদের নিদর্শন হামেশাই দেখা যেতো, এখন ঘোড়ার দর্শন পেতে যথেষ্ঠ ঘোরাঘুরি করতে হয়। সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বদর্শন হয় রেসকোর্সের মাঠের পাশ দিয়ে গেলে। মানে চোখ কান খোলা না রাখলেও নাক খোলা রাখলেই অশ্বদের অস্তিত্ব টের পাবেন। কারণ সেই একই। বাসের জানালা পথে পুতিগন্ধময় ঘোড়ার গোবর বেশ জানান দেবে। ওদের তো আলাদা করে বাথরুম পায়খানা করে দেয় নি। যেখানে খায় সেখানেই হাগে বলা চলে। তাই রেস কোর্সের কাছাকাছি গেলেই ঘোড়া দর্শনের আগেই ঘোড়ার হাগুর আঘ্রাণে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ছোটবেলা থেকেই আমার ধারণা এইসব ঘোড়াদের মালিকরা যথেষ্ট ঘোড়েল লোক কারণ ফেলুদা, টেনিদা, ঘনাদা আরও সমস্ত বাল্যকালীন দাদা-দিদিদের উপাখ্যান পড়ে জেনে গেছি রেসের মাঠে সর্বস্বান্ত হয়ে, এবং ফলস্বরূপ অশান্ত হয়ে, অনেকেই অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে কিম্বা ভাইস ভার্সা কেউ কেউ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে রেসের মাঠে সর্বস্বান্ত হয়। রেসের মাঠের ঘোড়াদের দেখলে রীতিমতো ঘোর লাগে চোখে। যেমন তাদের চেহারার চেকনাই তেমন তাদের চামড়ার চাকচিক্য। রীতিমতো তেল চুকচুকে। বোঝাই যায় এই ঘোড়াগুলোর মালিকানায় লক্ষীর ভাঁড় কানায় কানায় ভরে উঠছে ঘোড়ার মালিকের। কারণ মোটা, রোগা, বেঁটে, লম্বা, ফর্সা, কালো সকল প্রকার মানুষ জাতীয় প্রাণীমাত্রেই ভয়ঙ্কর নির্দয়। মনুষত্যের কোনো জীবকে কিছু দিচ্ছে থুচ্ছে মানে পরিবর্তে চতুর্গুণ পাওয়ার আশা – এ ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধর মতই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

তবে ঘোড়াদের অবলোকন করার মধ্যে যে প্রশান্তি, পৃষ্ঠে আরোহণ করলে তেমন শান্তি পাওয়া যায় না। কারণ শান্ত হয়ে মোটেই দাঁড়িয়ে থাকে না সে। রীতিমতো খরবায়ু বয় বেগে টাইপস সবেগে সম্মুখে চলে। সেই বেগের সাথে তাল রাখতে গিয়ে আপনাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। আর একটা ব্যাপার হল আপনি যদি ছেলেছোকরা হন হয়তো অসুবিধে হবে না, কিন্তু আমার মত বুড়োহাবড়া হলে ঘোড়ায় চড়ে ঘোরার মুস্কিল হল আমার হাতে পায়ে এমন জং ধরে গেছে যে ঘোড়ার পিঠের বৃত্তচাপ অনুযায়ী পাটাকে ফাঁক করে বেশিক্ষণ থাকলে খ্যাঁচ লেগে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাও আবার এমন জায়গায় ... না থাক। তাই ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘোরার থেকে গাড়ির পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে বেড়িয়ে আসা আমার মত আনাড়ির কাছে অনেকাংশে শ্রেয়। আর যেহেতু গাড়ির ইঞ্জিন ২০০-২৫০ হর্স পাওয়ার মানে ঘোড়াশক্তি, মনে মনে কল্পনা করে নিলেই হল যে আড়াইশ ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে ঘুরছি, বেশ একটা সূর্যদেব সূর্যদেব ফীলিংস হয়। সূর্যদেবের রথে সাতটা ঘোড়া, আমার আড়াইশ – ভাবলেই লোমহর্ষ হয়। তবে ঘোড়ার পিঠে না চাইলেও চড়তেই হয় কেদারনাথ যাওয়ার পথে। কারণ চোদ্দ কিলোমিটার চড়াই চড়ার দায়ভার নিজের আপন পায়ের ওপর সঁপলে পা খুলে হাতে চলে আসতে পারে। আমার মোটে দুটো পা, তাও নিতান্ত প্যাংলাপারা। ঘোড়ার পা আমার দ্বিগুণ – সংখ্যায় আর আয়তনে।

তাই কেদারনাথে পুণ্য সঞ্চয় করতে ঘোড়ার আশ্রয় নিতেই হয়। তবে সে নেহাত জাত-কুল-মান হীন ঘোড়া। ঘোড়াদের জাতবিচারে নিতান্ত অন্তজ। জারজও বলা চলে কারণ সেগুলি আসলে অশ্বতর বা খচ্চর। ঘোড়া ও গাধার "ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি" করে তাদের উৎপত্তি। কিন্তু পাহাড়ি পথে তাদের অমিত ব্যুৎপত্তি। যাকে বলে ডি ডি গেঞ্জির মত চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়। ঘোড়ার পিঠে নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত না হলে গৌরীকুন্ড থেকে কেদারনাথের মন্দিরে পৌঁছে দেয় অচিরেই। পুণ্য সঞ্চয়ও হল, সঙ্গে কোমর ব্যাথা ফ্রী। কিন্তু ঐ যে বললাম মানুষ প্রাণীটা যতটা পাবে তার চার ভাগের এক ভাগ দেবে। তাই আমরাও ভাড়া নিয়ে ব্যাগড়া দেব, ফলস্বরূপ খচ্চরের মালিক খচ্চরের সাথে খাবার দেওয়া নিয়ে খচরামি করবে, ফলস্বরূপ অশ্বতরগুলো খাটার অনুপাতে খাবার পাবে না। তাই তাদের হতকুচ্ছিত অবস্থা।

সে যাই হোক, ঘোড়া এক আজীব জীব। মানুষের সাথে ঘোড়ার সাধারণ পার্থক্য হল তারা মানুষের মত অনর্থক মানুষ মারে না (ঘোড়ারোগে কিছু গরীব মরে, কিন্তু তার জন্য ঘোড়াদের দায়ী করা অন্যায়)। তবে মানুষের সাথে তাদের বিশেষ পার্থক্য যে ঘোড়ারা দাঁড়িয়ে ঘুমোয় যেখানে কিনা মানুষ তার জেগে ঘুমোনোর সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টা শুয়েই ঘুমোয়। অবশ্য এই ঘুমোনোর হিসেব থেকে ইতিহাস কি বাংলা ক্লাসে বসে ঘুমোনোর হিসেবটা বাদ রাখতে হবে। তবে ঘোড়া সত্যিকারের দাঁড়িয়ে ঘুমোয় কিনা আমার সম্মকরূপে জানা নেই কারণ ঘোড়া নিয়ে ঘরকন্না করতেন আগেকার দিনের রাজা মহারাজা জমিদাররা (আর একালে রেসুড়েরা)। ঘোড়াদের যেমন রাজকীয় গুমোর তাতে রাজসমীপেই তাদের মানায় ভাল। বাকি যে পাঁচ ছশটা সিংহ পৃথিবীতে এখনো বেঁচে আছে ওদের নিরাপদে মেরে দিতে পারলে ঘোড়াদের পশুরাজ উপাধি দেওয়া যেতেই পারে (প্রসঙ্গত মানুষকে পশুদের তালিকা থেকে বাদ রেখেছি নয়তো পশুদের মধ্যে মানুষই রাজচক্রবর্তী)। রাজত্ব বিস্তারেও একসময় ঘোড়ারা ভারী কাজে দিত। এখন অবশ্য সে কাজে ঘোড়ার বদলে পরমাণু বোমা ছোঁড়ার মহড়া দেওয়া হয়। আমি নিতান্ত ছাপোষা বাঙালি। একটা মানবশিশু, মানে আমার শিশু কন্যাকে সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছি, একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করার মত আর্থিক ও বৈপ্লবিক ক্ষমতা আমার নেই। আমার ঘোড়া সংক্রান্ত বিদ্যে ঐ ক্লাস ফোরের রচনার খাতাতেই ফেলে এসেছি।

ছোটবেলায় জানতাম ঘোড়ার ইয়া মোটা ল্যাজ থাকে। আর অপশানাল দুটো ডানা থাকে। ডানা থাকলে তাকে বলে পক্ষিরাজ ঘোড়া আর সেই ডানাওলা পক্ষীরাজে করে উড়ে গেলে সুন্দরী রাজকন্যাদের সন্ধান পাওয়া যায় (পরে অবিশ্যি বড় হয়ে জেনেছি ঐ পক্ষীরাজ ঘোড়ার আধুনিক নাম মোটরবাইক। বাইকে বসে accelerator-এ ব্রুম ব্রুম করলে এ পাড়ার খেঁদী, ও পাড়ার বুঁচি সমস্ত ডাকসাইটে পরমা সুন্দরী রাজকন্যারা পিছনের সীট-এ আরোহী হয়)। আরও ছোটবেলায় ফিরে গেলে দেখতে পাচ্ছি খুদে আমি একটা প্লাস্টিকের নির্জীব ঘোড়ায় আরোহী হয়ে সোৎসাহে বলছি "আম পাতা জোড়া জোড়া মারব চাবুক ছুটবে ঘোড়া"। অত্যন্ত অখাদ্য পদ্য কারণ জোড়ার সাথে ঘোড়ার মিল ব্যতীত দুটো লাইনের মধ্যে কোনো আপাত সম্বন্ধ নেই। কিন্তু সেই শিশুকালে নিজের রসে নিজেই মজে ছিলাম। সাহিত্যরস উপলব্ধি করার বয়স সেটা ছিল না। আর একটু বড় হলে দেখেছি ঘোড়া নিয়ে রাজারাজড়াদের মধ্যে ভারি অশান্তি। আমার ঘোড়া আমি শালা জবরদস্তি তোমার রাজ্যে চড়াবো। চড়াতে না দিলে যুদ্ধ করো আর চড়াতে যদি দাও তার মানে তুমি নতিস্বীকার করলে, আমায় রাজস্ব দাও। ভারি অন্যায় আব্দার। কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আগে এরকমই কিছু একটা করার রীতি ছিল।

মোটের ওপর ঘোড়া নিয়ে ভারতবাসীর পক্ষপাতিত্ব গোড়া থেকেই বেশি। পুরীর সমুদ্রে গেলেই দেখতে পাই ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার জন্য কিছু লোক ভাড়ার ঘোড়ার পেছনে ঘুরঘুর করছে আর ঘোড়াগুলো ঘাড় ঘুরিয়ে টেরিয়ে টেরিয়ে তাদের মাপছে। বোঝার চেষ্টা করছে তার মোলায়েম পিঠে চড়ার এলেম তাদের আছে কিনা। ঘোড়া দেখলেই যে মানুষ খোঁড়া হয় পুরীর সী বীচে গিয়ে তার সত্যতা নিজের চোখে যাচাই করে আসতে পারেন। তবে আপনার ঘাড়ে

একটা মাথা থাকলে ঘোড়া টপকিয়ে ঘাস খেতে যাবেন না কারণ ঘোড়ার পায়ের একটা চাট খেলে চট করে ঘাড় তুলতে পারবেন না। তাই ঘোড়াদের বলিষ্ঠ পায়ের থেকে হাতখানেক দূরে থাকুন। আপনার পকেট গড়ের মাঠ হলে গরীবের ঘোড়ারোগ এড়িয়ে চলুন আর পকেটে প্রয়োজনাতিরিক্ত মালকড়ি থাকলে সংগ্রহ করে ফিরুন ঘোড়ার ডিম।

[পুনশ্চঃ এই পর্যন্তই লিখেছিলাম। এক দিদি লেখাটি পড়ে বললেন ঘোড়ার কথায় এসেও তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোড়া মিস করে গেছ। সেটি হল সেই ঘোড়া যেটা ঘুরলেই উত্তপ্ত ধাতুখন্ড ছোটে তোমার শরীর তাক করে। আর তার স্পর্শসুখ খুব একটা সুখকর নয়। আমি বললাম "যাহ, ট্রিগার অর্থে ঘোড়াটা তো ভুলেই গেছিলাম।"]

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দূর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পারিজাত ব্যানার্জী

"দুই শালিক"

পর্ব ২

আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি, জানো মা! খুব ভোর, মানে ওই যখন আকাশের এক কোণে লেগে থাকে সামান্য কয়েক ছটা নতুন কেনা টুনির আলো, আনুমানিক, সেই সময়। সেই তখন থেকে ছাদে উঠে বসে অপেক্ষা করছি, দিনের শুরুতে সব্বার আগে দুই শালিক দেখার।

তোমার মনে আছে মা, আমি যখন বাগানে সারাদিন বসেও দুই শালিক দেখতে না পেয়ে হাহুতাশ করতাম, তুমি কেমন আকাশ দেখাতে আমায়! বলতে, "ওই তো দেখ, কেমন উড়ে চলেছে হাজার হাজার শালিক, ময়না, কাক, চড়াই ! জেনে রাখা ভাল, ওর মধ্যে ঠিক লুকিয়ে বসে আছে তোর দুই শালিকও ! তোর সৌভাগ্য ওদের বাসায় দোল খাচ্ছে আপনমনে ! তুই ও নিয়ে আর ভাবিসনা মা, কেমন ! ওরা দেখিস, সব দিয়ে কেমন রক্ষা করবে তোরই অনন্য লাজুক ওই সত্তাকে !"

কাল সারারাত অবাক হয়ে ভেবেছি জানো, খোঁজ নিতে হবে। আমার সৌভাগ্যকে দুই শালিক ঠিকমত রেখেছে কিনা, জানতে হবে তো ? সেই কোন ছোটবেলায় ওরা আমার কাঁথার থেকে ওকে টুপ করে তুলে মিলিয়ে গেছে কেমন হাওয়ায় – কই, তারপর থেকে তো আর কোনো খোঁজখবর নেই ? ওটা তো আমার সৌভাগ্য, তাই না ? তবে তা ওদের বাসায় ওরা ফেলে রেখে এসেছে কেন আজও ?

আচ্ছা, তোমার কথা তো মিললনা ? ওরা তো যত্নে রাখেনি আমার সহোদরকে ? পেটের মধ্যেকার তাই কেমন মুচড়ে ওঠে মা আজকাল – টের পাই, ভালো নেই, জানোতো, একটুও ভাল নেই আমার পোড়াকপালি 'সৌ'ভাগ্য !

আমি জানো, কোনোদিন এক শালিক দেখিনি কিন্তু ! ওই যে, তুমি বলেছিলে না, আছে, আছে – সব আছে ওই আকাশের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু হয়ে, তাই আমি বিশ্বাস করে এসেছিতো বলো এতকাল ? তাহলে আমার ভাগ্যের শিরায় উপশিরায় এমন বটবৃক্ষের জটা ঘনীভূত হল কিকরে বলতে পারো ? তাই দেখোনা, কেমন, শান্ত, স্থির হয়ে দিব্যি বসে রয়েছে সে একজায়গায় ? স্থবির, চলৎশক্তিহীন !

অথচ আমি তো জানি, ও উড়তে পারে ! আমি তো দেখেছি ওই বুদবুদকাটা কোণে ওকে সবার আগে উড়তে সকালবেলায় ! তবু কেন বলতে পারো, কেন উড়ে আসেনা হাবিজাবি সব পাখিদের ভিড় থেকে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে একান্ত আমার সেই পোষ মানা দুই শালিক আমার দোরগোড়ায় ?

এই দেখো মা তাই কি এনেছি এবার! দেখো, বেশ বড়সড়ই একটা খাঁচা কিনেছি কেমন সোনার ! তার উপর আবার রত্নখচিত, ভাবা যায় আজকাল ! সেই ভোর থেকে তাকিয়ে আছি আকাশের বুকে মুখ ডুবিয়ে – আজ ওদের এবেলা একবার দেখতে পাই শুধু, 'সৌ' আর 'ভাগ্য'কে একদম আর ছেড়ে যেতে দেবো না !

নিজের হাতে বাটা কাঁচের গুঁড়োর দানা দেব খেতে ওদের ঠোঁটকাটা চিৎকারগুলোকে স্রেফ উপেক্ষা করে !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বহিরাগত

কাটরার হোটেল থেকে তিনটে গাড়ি সকাল আটটায় একসাথে ছাড়ল। দুটো ছোট বাস যারা ট্রাভেল এজেন্টের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যাতায়াত ও সাইটসিন করবে এবং একটি শেভরোলে ট্যাভেরা যাতে পাঁচজনের একটি পরিবার যার ক্ষুদ্রতম সদস্য আট বছরের একটি মেয়ে। সঙ্গে আছে তার মা, বাবা, অকাল বার্ধক্যে নড়বড়ে দাদু আর অমৃতসর স্টেশনে নেমেই পা ভেঙে পঙ্গু দিদা। অমৃতসরের হাতুড়ে বলেছিল পা ভাঙেনি, কেবল স্প্রেইন হয়েছে। খান কতক পেইনকিলার আর মলম নিজেই বেচে বিদায় নিয়েছিল। কাটরায় সরকারি হাসপাতালে ধরা পড়ল একটা নয় দুটো হাড় ভেঙেছে হাঁটুর ঠিক নীচ থেকে এবং মূল ভারবাহী হাড় টিবিয়া ভেঙে সরে গেছে। শল্যচিকিৎসা ছাড়া গতি নেই এবং সেটা কলকাতায় ফিরেই করা ভালো। ট্রাভেল এজেন্ট টাকা ফেরৎ দেবে না, ওদিকে তৎকালেও এসি টু টায়ারের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাড়তি কুড়ি হাজার দিয়ে একটি পালোয়ান ড্রাইভারসহ ট্যাভেরা নিয়ে বকেয়া ভ্রমণ সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। জামাই শ্বাশুড়ির চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দিলেও শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, স্ত্রী, কন্যা এবং ট্যুর অপারেটর অভিজিৎ বোস সকলেই বেড়িয়ে 'উপভোগ' করার পক্ষে রায় দিল। তাই আপাতত পায়ে জসন্দল স্ল্যাব লাগিয়ে ও বেডপ্যান কিনে ওরা সিলেবাস কমপ্লিট করছে। পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উসুলের জন্য আরও বিশ-ত্রিশ খরচ করা ছাড়া উপায় নেই।

পাহাড় শম্পা আর সপ্তর্ষির নেশা। ট্রেকিং-এর সাধ থাকলেও এখনও পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। তবে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করলেই অধিকাংশ সময় হিমালয়ের বুকে পিঠেই চড়া হয়। প্রথমে ঠিক ছিল, কিন্নর কৈলাশ, লাহুল স্পীতি শুদ্ধু। জায়গাটা বেশি উঁচু ও যাত্রাটা ধকল সাপেক্ষ বলে শম্পার মা বাবা রাজি হচ্ছিলেন না। তাছাড়া লাহুল-স্পীতি কোনও পছন্দসই ও নির্ভরযোগ্য ট্যুর অপারেটর নিয়েও যাচ্ছিল না। শেষে কাশ্মীরের নাম করাতে মা বাবা দুজনে এক পায়ে খাড়া। চাকরি থাকতে কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়ার পরিবেশ ছিল না বলে অমরেশবাবু কতবার আফশোস করেছেন। আজ বড় মেয়ের সৌজন্যে ভূস্বর্গারোহনের বিরল সৌভাগ্য – ছাড়া যায়? কিন্তু স্বর্গের পথে প্রথম ধাপেই অত বড় দুর্ঘটনা। নেহাৎ বিস্তর খরচ করে বুকিং হয়ে গেছে যা ফেরৎ পাওয়া যাবে না, তাই মেয়ে জামাই নাতনীর আনন্দটা মাটি করবেন না বলে আরতি দেবী অবর্ণনীয় কষ্ট সয়ে হাসি মুখে রয়েছেন। দুই মেয়েই যে যখন বেড়াতে যায় মা বাবাকে ঘুরিয়ে আনে। এর আগে এই বড় মেয়ের সাথে দক্ষিণ ভারত বেড়িয়ে ফেরার পথে মেয়েরই পা ভেঙে যায়। শাড়ির দোকানের দিকে নজর রেখে বাস থেকে নামতে গিয়ে দু পায়ের পাতা মুচড়ে সপাটে পতন। বাসে প্রবল যন্ত্রণা সয়ে বসে থেকে মা বাবা বর আর কন্যাকে জোর করে মাইশোরের বাকি জায়গাগুলো দেখিয়ে নিয়েছিল শম্পা। তারপর একটা পায়ে প্লাস্টার, অন্য পায়ে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় ক্রেপ ব্যান্ডেজ। টাটা ইন্ডিকা ভাড়া করে মহীশূর থেকে চেন্নাই ফিরতে হয়েছিল কলকাতায় ফেরার ট্রেন ধরার জন্য। মাইশোর থেকে চেন্নাইয়ের ট্রেনের বুকিং ক্যানসেল করা যায়নি। সেটা ছিল ভ্রমণের শেষের দিকে, দেখা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। দুটো পায়ের পাতা ফাটায় কোনও পায়েই ভর দেওয়া যাচ্ছিল না। তবু বেডপ্যান নেয়নি। তবে কন্যার পটি খুব কাজে এসেছিল ছোট বাইরের জন্য। কিন্তু মায়ের গোটা শরীরবাহী মূল হাড়টাই গেছে এমন ভাবে দু টুকরো হয়ে, যে অন্যের ঠেক নিয়েও দাঁড়াতে পারছেন না। আর এবার আট বছরের নাতনীর জন্য স্বাভাবতই পটি আনা হয়নি। মহিলা সব চেপে চুপে গাড়িতে চুপ করে বসে আছেন। স্ল্যাবের ঘষা লেগে উরুর পেছনের ছাল উঠে যাওয়ায় জ্বালা করছে। কাউকে বলেননি এখনও পর্যন্ত। এত কষ্টের মধ্যেও পাহাড়ি রাস্তার নিসর্গ যেটুকু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখা যায় দেখার চেষ্টা করছেন। তাঁর স্বামী সামনের সীটে বসায় বিনা পরিশ্রমে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন।

পাটনিটপে মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির কথা। ছোটো গাড়ি বাসগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে গিয়ে খাবার জন্য পাটনিটপে অপেক্ষা করল ঘন্টাখানেকের বেশি। একটা পার্কে খাওয়ার কথা ছিল। তার বদলে হতশ্রী এক ধাবায় খাবার

পরিবেশন করা হল। সর্দারজি ড্রাইভার শত অনুরোধেও গাড়ির মাথায় বাঁধা প্যাকিং খুলতে রাজি হল না। বেডপ্যান সেখানে বাঁধা, গরম জামাকাপড়ও ওপরে। অনেকেই টয়লেটে গেল। পা ভাঙা মহিলা ছোট বাইরে চেপে গাড়িতে বসে যা হোক করে খেয়ে নিলেন। জায়গাটা বেশ মনোরম। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, গায়ে তেমন শীত অনুভূত না হলেও দূরে পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখা যায়। ওহ! শীতকালে এলে আর কোথাও যাওয়ার দরকার হবে না। যাদের গাইডেন্সে আসা, তারা নিজেদের সুবিধামতো ব্যবস্থা করছে। যাত্রীদের মনঃপূত হোক বা না হোক। কারোর তো কিছু করার নেই। সুতরাং গাড়ি চলল। ঝিলম নদী ছুটল সাথে সাথে। ওরা পাঁচজন ছোট গাড়ি নিয়ে অনেকটা সময় এগিয়েই ছিল। কিন্তু বোস তো নয়ই, এমন কি দিন প্রতি ইচ্ছামতো ঘোরার শর্তে ভাড়া নেওয়া সপ্তর্ষিদের শেভরোলেও কিছুতেই পাটনি টপের দর্শনীয় ছোটদের পার্কটায় নিয়ে গেল না। যেখানে গাড়ি থামাতে বলা হয় হতচ্ছাড়া ড্রাইভারকে, থামে তার চেয়ে কমপক্ষে দু মাইল এগিয়ে। মনোমতো ছবি পাওয়া যায় না। এসব জায়গায় তো প্রায় আটটা পর্যন্ত রোদ থাকে। জওহর টানেলের মানে স্বর্গের ঠিক মুখটার একটা ছবি তুলতে হবে। ছোট্ট কুর্চি মা বাবার দেখাদেখি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে, "দিদু, তোমার কষ্ট হচ্ছে? হিসি পায়নি তো? পা ভালো করে ছড়িয়ে বসবে?"

বনিহালের আগেই ট্যাভেরা থেমে গেল বাসদুটোর অপেক্ষায় নয়, জওহর টানেলে যানজটের জেরে। কতক্ষণ লাগবে টানেল পৌঁছতে, সে প্রশ্নের এক এক জন এক-এক উত্তর দিতে লাগল। তখন রোদ থাকবে তো ফটো তোলার মতো? রাস্তায় এত দেরি হচ্ছে, মা এই অবস্থায় কতক্ষণ সহযোগিতা করতে পারবে ... নানা চিন্তায় মেয়ের মাথা আকীর্ণ। জামাই অবশ্য ফটোটটো নিয়ে অত ভাবিত নয়। তার চিন্তা অভুক্ত কন্যা ও বাকিদের খাওবার ব্যবস্থা নিয়ে। বৌয়ের কথা মানলে চলবে না। রাস্তায় কোনও ধাবাতে পেট ভরাতে হবে। জওহর টানেল পার করতে করতে রাত সাড়ে দশটা পেরিয়ে গেল। ঘিঞ্জি শহরের রাস্তাতেও এমন মোক্ষম যানজট আজকাল দেখা যায় না। একটিই মাত্র টানেল আর অসংখ্য গাড়ি অবস্থা জটিল করে দিয়েছে। কোম্পানির ভরসা না করে একটা ধাবায় শেভরোলে দাঁড়াল। ফর্সা ফর্সা কাশ্মীরি ছেলেরা দুহাতে খেতে খেতেই এঁটো হাতে পরিবেশন করল রুটি, রাজমা, টমেটো তড়কা, পনির মসালা। খিদের মুখে তাই অমৃত। এমনকি অনশনে থাকা বাচ্চা মেয়েটাও খেয়ে নিল তৃপ্তি করে। সর্দারের আবার ভাতও চাই। কনডাক্টেড ট্যুরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিধর্মীর হাতে না খাওয়া! হায়রে হুজুক, হায় সংস্কার!

জ্যামে গাড়িগুলোর দূরত্ব কমে এসেছিল। অভিজিৎ বোস বাস থেকে ঐ ধাবাতেই নেমে বলল, "মুখার্জীদা, আপনারা শ্রীনগর পৌঁছে মমতা চকের গৌসিয়ার পাশের হোটেলে রুম নিয়ে নেবেন।" আগে বলেছিল গৌসিয়াতেই বুকিং আছে। এখন বলছে তার পাশেরটায়। হোটেলের নাম বলতে পারল না ঠিকমতো। এরা শেষ মুহূর্তেও আশ্রয়ের নাম বলতে পারে না। এটা অমৃতসর থেকেই লক্ষ্য করেছে শম্পা। এখানে নিজেদের প্রিপেইড মোবাইল অকেজো। ভরসা ড্রাইভারের চলভাষ।

মমতা চকে বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে নির্দিষ্ট হোটেলদ্বয় খুঁজে পেয়ে ঘর চাইতে রিসেপশানে বসে থাকা ছেলেরা বেজায় বেজার। তারা বোস স্পেশালের নামই শোনেনি। একপ্রস্থ ফোনাফুনির পর গৌসিয়ার লাগোয়া হোটেল ইরাম যে ঘরগুলো খুলে দিল তা ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট ও এক দেওয়ালে চাদর ঝোলানো নরকের খুপরি বললে অত্যুক্তি হয় না। অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে ঘরের মেঝে থেকে দুফুট উঁচুতে অবস্থিত বাথরুমের দিকে করুণ চোখে চেয়ে রইলেন। একতলার ঘরই চাই। কাণ্ডারী সপ্তর্ষি খুঁতখুঁত করার অবস্থায় ছিল না রাত তিনটের সময়। বৌ শ্বাশুড়িকে বেডপ্যান দিয়ে শ্বশুরকে লুঙ্গি পাঞ্জাবি বার করে দেবার পর নিজেদের দোতলার খুপরিতে ঢুকে বলল, "আর পারছি না। সকালে দেখা যাবে।"

"আমাদের ঘরের জানলার ওপারে একটা করিডোর আর সার সার ঘর। পর্দা সরানোই যাবে না।"

"কাল দেখব।"

“কাল হতে বাকি কোথায়? সাড়ে তিনটে বাজতে চলল।”

“ওঃ! ঘুমোতে দাও।”

ঘুমটা অবশ্য এল না বোসের বাকি যাত্রীরা এসে পড়ায়। তারা রুম দেখে চ্যাঁচামেচি জুড়েছে। শম্পা গিয়ে দেখে এল ওরা যে ঘরগুলো নিয়ে প্রবল রুষ্ট সেগুলো শম্পা ও তার মা-বাবার কামরার তুলনায় স্বর্গ।

“কাটরায় মাকে রুমে রেখে রিসেপশনে আসতে একটু সময় নিয়েছিলাম বলে ঘরই পাচ্ছিলাম না। আর এখানে সবার আগে এসে সব চেয়ে ওঁচা রুম?” সপ্তর্ষির নাক কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আবার ডাকতে লাগল।

বুকিং ছিল গৌসিয়ায়। মালিকের প্রক্সি দেওয়া তার দাদা নাকি দয়া পরবশত কয়েকটি বাঙালি পরিবারকে বোস ট্রাভেলস্-এর বুক করা রুম দিয়ে দিয়েছে। তাই তারই আত্মীয়র হোটেল ইরাম-এ রুমের সুবন্দোবস্ত করেছে। দিনের আলো ফোটার আগেই পরিস্কার হয়ে গেল মে মাসের ভরা মরশুমে সাতশ টাকার বুকড রুম তিন-চার হাজারে অন্যকে দিয়ে ফায়দা লুটছে গৌসিয়া। আর ইরামের ওপর পড়েছে গৌসিয়ার দায়। ইরামের কর্মীরা বোর্ডারদের রিফিউজির বেশি কিছু ভাবছে না।

“চাদর গন্দা হেয়।”

“কঁহা গন্দা? ঠিক তো হেয়।”

“এক রেজাই অর এক সিরানা লগেগা..”

... উত্তর নেই।

“ ভাইয়া, বাথরুম গন্দা হেয়। সাফ করওয়া দিজিয়ে।”

“সব ঠিক হেয়। গন্দা হেয় তো রুম খালি কিজিয়ে।” ভাইয়া সম্বোধনের উত্তরে এত ঝাঁজ?

হাক্লান্ত আরতি সারা রাত কম্বলের অভাবে অসমান বিছানায় ভাঙা পা নিয়ে এপাশ-ওপাশ পর্যন্ত করতে পারেননি। নড়বড়ে স্বামী বেডপ্যান দিলে আশঙ্কা এই বুঝি হিসি ছলকাল। আবার তাঁকে ডেকে ডেকেও সব সময় সহযোগিতা পাওয়া যায় না। রাত ভর বৌকে কাঁদিয়ে ভোর হতে অমরেশ দয়া করে মেয়েকে ডাক দিলেন। আগের হোটেলগুলোতে ঘরের মেঝে ও স্নানঘরের মেঝে মোটামুটি এক লেভেলে ছিল। এখানে বাথরুম দু ফুট উঁচুতে। অমরেশই দেওয়াল ধরে বহু কষ্টে উঠছেন নামছেন। এই বাথরুমে মাকে নিয়ে যাওয়া শম্পার একার কম্ম নয়। অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে ডাক পড়ে জামাইয়ের – শ্বাশুড়িকে বুকে জড়িয়ে যথাস্থানে তুলে দেওয়া ও নামিয়ে নেওয়ার জন্য।

চারদিন থাকতে হবে এই নরকতুল্য ঘরেই। অথর্ব বাপ, পঙ্গু মা আর ভদ্রলোক বরের জন্য চুপচাপ কাটিয়ে দিচ্ছে শম্পারা। মেয়েটা বাবার বুকে ঢুকে শোয় বলে দুটো বালিশেই হয়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য এটাই যে এত অব্যবস্থার মধ্যেও জল, এমনকি গরম জলেরও অভাব হয়নি -যদিও এই নোংরা ঘরে স্নান করে কোনও তৃপ্তি নেই। লোডশডিংও হয় না বোধহয়। তবে একবার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল শুধু এই হোটেলে, বোসের পার্টিদের তাড়ানোর জন্যই কি? এর পরেও সবুজ টিশার্ট পরা একটি সুদর্শন ছেলে এসে তার গোলাপি ঠোঁট দিয়ে আগুন উগরে গেল, “ঘরমে খানা মনা হেয়। জমিন মে থালি নহি রখনা। হামারা ফর্শ গন্দা হোনা নহি চাহিয়ে।”

বাকি যাত্রীরা তো অতটা অসহায় নয়। উত্তর এল, “আপকা তো পুরা হোটেলহি গন্দা হেয়।”

অগ্নিতে ঘৃতাহূতি! “গন্দা হেয় তো নিকলো বাহার। ইয়ে হামারা প্রপার্টি হেয়। অপনি খুন পসিনেসে বনায়া ইসে। পসন্দ নহি তো চলতে বনো।” সকালের শুরুটা ভালোই হল।

ভরা মরশুমে পর্যটকরা শুধু হালালকা বখ্‌রা নয়, শরনার্থীর অধম। যে রুমের ভাড়া পাঁচশোর বেশি হতে পারে না, তার জন্য তিন-চার হাজার নেওয়া হচ্ছে। আগে থেকে বুক করা রুম বেশি দামে অন্য লোককে দিয়ে বোস স্পেশালের মতো বড় ট্যুর অপারেটরদেরও পথ দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাত্রীদের মধ্যে যারা গলার জোর দেখাতে পেরেছে, তারা বোস বা তার স্থানীয় এজেন্টের গচ্চায় অন্য হোটেলে উঠে যেতে পেরেছে। একজন স্বামী মরো-মরো এমন পৃথুলা বৃদ্ধাও উন্নততর ব্যবস্থা বাগিয়ে নিতে পেরেছে। শুধু সপ্তর্ষির মতো সদাশয় মানুষ, যার ঘাড়ে প্রতিবন্ধী দুই বুড়োবুড়ি আর হাঙ্গারস্ট্রাইক করা বাচ্চা, জলের মতো পয়সা খরচের বিনিময়ে সর্ব নিকৃষ্ট পরিসেবায় তুষ্ট থাকছে। গৌসিয়ায় এক মারাঠি দল কিচেনের দখল নিয়েছে। বোসের রাঁধিয়েরা মালিকের ডাক্তার বড়ভাই লোনের রক্তচক্ষুর সামনে রান্না করছে নোংরা উঠোনে। বৃষ্টি পড়লে হয়ে গেল। খাওয়ার কোনও সময় নেই। বিকেল চারটেয় দুপুরের খাবার, রাত একটায় নৈশাহার। মরশুমের ফায়দা ওঠাচ্ছে গৌসিয়া। আর ইরাম গৌসিয়ার দায় নিয়ে বোর্ডারদের ওপর ঝাল মেটাচ্ছে "বাথরুম উইল রিমেইন ডার্টি। অ্যাট ইওর হোম ইউর বাথরুম ইজ অলসো ডার্টি ..."

এরই মধ্যে সকালবেলা যাওয়া হল সিলেবাসে থাকা শ্রীনগরের বাগিচাগুলো ও শঙ্করাচার্য মন্দির দর্শনে এবং শিকারায় যাচ্ছেতাই ভাড়া দিয়ে ডালহ্রদ বিহারে। ডাল হ্রদ যেন একাধারে শ্রীনগর শহরটাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে রেখেছে, আবার একে ঘিরেই শ্রীনগর। যেখানে যাও ডাল লেকের চমৎকার দৃশ্য। সেই সাথে দূরে পাহাড়ের মাথায় তুষারের শুভ্রতা। গায়ে গরম জামা রাখার দরকার পড়ে না, অথচ বরফ দেখা যায় এমন দূরত্বেও যেন উড়ে গিয়ে ছুঁয়ে আসা যাবে। পার্কগুলোতে কাশ্মীরি চিরাচরিত পোষাক পরিয়ে যে ছবি তোলা হচ্ছিল, কাশ্মীরের কোনও মেয়ে বা পুরুষের গায়ে অমন ঝলমলে পোষাক আর বড় বড় গয়না দেখা যায় না। প্যান্ট-শার্ট আর সালোয়ার কামিজেরই জনপ্রিয়তা। কদাচিৎ দু-এক জন বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের গায়ে কম্বলের মতো কাপড়ের আলখাল্লা দেখা যায় যার আস্তিনদুটো প্রায়শ এমনি ঝোলে আর পরনদার পোষাকের মূল গহ্বরে নিজেদের হাতদুটো ঢুকিয়ে রাখে। কয়েকজন গরিব মহিলার গা ছাড়া ফিরান তো চোখেই পড়ে না। আচ্ছা পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং ছাড়া কেন এমন করে ছবি তোলানোর রেওয়াজ নেই? সেখানেও টার্গেট মূলত বাঙালি ট্যুরিস্ট। কলকাতায় বাইরের পর্যটকদের তো বাঙালী ধুতি-পাঞ্জাবি আর আটপৌরে করে শাড়ি পরিয়ে ছবি তোলানোর কথা কারও মাথায় আসে না। ফেরার পথে একটা দোকানে গরম মশলা দেওয়া লিকার চায়ের আতিথেয়তার মান না রেখে দাম শুনে বিষম খেয়ে বেরিয়ে এল শম্পারা। বাবা আর সপ্তর্ষি তো পটেই গিয়েছিল।

সোনমার্গ যাওয়ার রাস্তায় সিন্ধু নদ আর বরফের টুপি পরা পাহাড়চূড়া দেখে শম্পা আর কুর্চি তো অভিভূত। মনে হল হোটেলর সব গ্লানি মুছে গেল। কিন্তু সিংজীর বিশেষ আগ্রহে সোনমার্গে গিয়ে ঘোড়াওয়ালা ও স্লেজওয়ালাদের মিলিত অত্যাচারে শরীর জেরবার করে আড়াই হাজার ফুটুস্‌। ভাগ্যিস বাবা ঘোড়ায় চাপেননি। যা বিপদসঙ্কুল রাস্তা! আর তার ওপর বৃষ্টি, কাদা। ঘোড়াওয়ালারা নিজেদের বৌ-মেয়ের গায়ে কেউ হাত দিলে কী করবে কে জানে, অথচ ম্যাডামদের হাত ধরে টানাটানি। বৃষ্টি কাদাজল আর ফাটা জুতোর জেরে ঠাণ্ডায় বেহাল শম্পা ও মেয়ে টুকাই। মা সিংজির কোলেপিঠে চেপে গাড়িতে উঠে বসে থেকেছেন। হোটেলের ঘরে বিশ্রাম নেওয়া আর হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কাটানো-খুব আলাদা নয়। বাবাও কোথাও বিশেষ নামছেন না। আলাদা গাড়ি বলে সোনমার্গের দিন দুপুরের খাবার জোটেনি। বাকি গাড়িগুলোর দেখাই পাওয়া যায়নি, ড্রাইভারের ফোন কাজ করলেও বোসরা যোগাযোগ করেনি। শম্পার ঠক্‌ঠকানি আর রাগ দেখে সিংজির খিদেও নীরব। বিনে পয়সায় বাথরুম সারারও উপায় নেই। ফেরার পথে কুড়ি টাকার টিকিট কেটে নদীর ধারে এক ঘেরা রেস্তোঁরায় টয়লেট সারল শম্পা। সেখানে ওর কাঁপুনি দেখে কয়েকজন স্থানীয় লোক আঁচ পোয়ানোর ব্যবস্থা করে দিল। একজন মস্করা করল, "দিদিকো কাশ্মীরকি গরমী লগ গয়ী!"

ফিরে এল পেটে সারা দিনের ক্ষিদে আর শরীর ভরা ক্লান্তি নিয়ে। এরপরেও রুমে ঢুকে ঘুমোনোর জো নেই। কখন মার প্রয়োজন হয়।

তৃতীয় রাতে সজাগ ঘুম ভাঙল মহিলা কণ্ঠের তীব্র চিৎকারে। "ইউ ক্যাননট টক টু আস লাইক দ্যাট। উই হ্যাভ বোর্ডেড দিস হোটেল এ্যান্ড পেয়িং ইউ ..."

"শাট আপ। উই ক্যান ডু হোয়াটেভার উই লাইক। দিস ইজ আওয়ার প্রপার্টি। হাম কশ্মীরি হেয়, আপ আউটসাইডার।"

"উই হ্যাভ বোর্ডেড দিস হোটেল ফর থ্রী ডেজ। টুডে ইজ দা ফার্স্ট ডে। উই আর নট সাপোজড টু চেকাউট টুমরো –"

"ডোন্ট ফরগেট দ্যাট ইউ আর ইন আওয়ার ল্যান্ড। হাম জব কহেঙ্গে ইয়ে হোটেল তো কয়া, কশ্মীর ছোড়কর জানা পড়েগা ..."

ঝামেলাটা তাহলে শুধু বোস স্পেশালের সাথে নয় ! পর্যটকরা এদের নজরে মূলত বহিরাগত ! রাত দুপুরে 'কাশ্মীরি' যুবার দর্পিত আস্ফালনে হৃদকম্প হল শম্পার। এরা কারা! হোটেলের চাবির বদলে হাতে অস্ত্রই যেন বেশি মানানসই। অবলীলায় এক ভাই বেইমানি করে আর এক ভাইকে লেলিয়ে দিচ্ছে কামড়ানোর জন্য। শম্পাদের যদি বলে "কল খালি করনা হেয়"? যাদের টাকা প্রতি এত লোভ, তাদের প্রতি এত ঘৃণা ? অথচ বাংলার কাশ্মীরপ্রীতির কারণে অনেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। নিজেদের মধ্যে বলে কশ্মীরি যার বিন্দুবিসর্গ বোঝা যায় না। দুরন্ত উর্দু হিন্দী সিনামার পরিবেশনা। ডাঃ লোনের নিজের জবানিতেই "বাঙালি আজিব জাত। অপনি কামাইকা আধা হিস্যা ঘুমনে ফিরনেমে খরচ কর দেতে। হামারি কশ্মীরকো ওলোগ ভুসর্গো কহেতে হেয়!"

পরের দিন ঘোড়াওয়ালাদের ঝামেলায় গুলমার্গের রাস্তা বন্ধ। এমনিতেই সপ্তর্ষিরা ঠিক করেছিল এইদিনটা আর অনাহারে ধকল করে অ্যাসিডিটি নয়, বিশ্রাম। এই ঘোড়াওয়ালারা সোনমার্গ গুলমার্গের আতঙ্ক। তার পরের দিনই পহেলগাঁও যাত্রা সকাল নটার মধ্যে প্রাতরাশ করে। বিকেলটা কেনাকাটা করল মায়ের মন রাখতে। বেচারা কিছুই তো দেখলেন না, অন্তত শালের শখ মিটুক। বেয়ানের জন্য কেনারও টাকা দিয়েছেন। রাস্তায় আজ নিজেদের ভাড়া করা গাড়ির বদলে হেঁটে আর পাবলিক বাসে ঘুরল শম্পা, সপ্তর্ষি আর কুর্চি। বাসের যাত্রী থেকে কনডাক্টার সবার ব্যবহার কী আন্তরিক, হোটেল মালিক বা কর্মীদের সাথে মেলানো যায় না। পর্যটকদের সত্তর শতাংশ বাঙালি হওয়ায় অনেকেই অল্পবিস্তর বাংলা বলতে পারে। পুরুষদের কাউকে কাউকে স্থানীয় বা কাশ্মীরি মনে হচ্ছে বলে শম্পা মন্তব্য করায়, তারা বেশ লাজুক লাজুক হেসে ফেলে। নিজেদের রূপ নিয়ে কাশ্মীরি ছেলেরা বেশ সচেতন ও গর্বিত। মেয়েদের ভালো করে দেখাই হল না, গাত্র বর্ণ গৌর বোঝা গেলেও মুখ চোখের পরিপূর্ণ রূপ, মানসিকতা কোনওটার সাথেই পরিচিত হওয়া গেল না। এক বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "কশ্মীরকে সাথ তো বঙ্গালকা বহুত পুরানা রিশ্তা। হমারি হ্যান্ডিক্রাফ্ট্স্ কি ভি বহুত ডিমান্ড হ্যায় বঙ্গালমে।" বাংলায় কথা বলে বাঙালি পর্যটকদের ইমপ্রেস করার আগ্রহটা বেশ মজার। তবে কাশ্মীরি বলে যতটা গর্ব, ভারতীয়-হিন্দুস্তানী বা ইন্ডিয়ান পরিচয়টার প্রতি যেন ততটাই উদাসীনতা। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল শম্পা, অন্যান্য পাহাড়ি শীতপ্রধান জায়গার মানুষের মতো গায়ে দুর্গন্ধ নেই এদের। পোষাকও অপরিচ্ছন্ন নয়। দোকানের হদিশ দেওয়া থেকে হোটেলে ফেরার পথ নির্দেশ দেওয়া, সব ব্যাপারেই সহযোগিতা। এরাও কাশ্মীরি, যারা বলছে, "পহেলে সাত বজেকে বাদ সব ঘরকে অন্দর হো যাতা থা; অব তো দাদা আপ বৌদিকো-বচ্চিকো লেকে রাত বারা বজে ভি রস্তেমে ঘুমেঙ্গে তো কোই খতরা নহি" ... ?! কিন্তু এরা তো থাকার বন্দোবস্তো করতে পারবে না !

সকালে নতুন একটা মুখ, হোটেলের লিজ নেওয়া সদ্য মালিক দরজায় দরজায় পিটিয়ে ঘোষণা করতে এসেছিল রুমে কাপড় কাচা মানা, করিডোরের মেঝেতে থালা রাখা মানা।

শম্পা সাথে সাথে প্রশ্ন করে, "আপকে হোটেলমে লন্ড্রিসার্ভিস হেয় ?"

"হেয় না। বতায়া কিসিকো ?"

"রুম সার্ভিস নহি হেয় অর আপ লন্ড্রিকি বাত কর রহে হেয়?"

"কিসনে কহা রুম সার্ভিস নহি হেয়? আপনে পুছা কিসিসে?"

"হর স্টাফসে পুছা। এক সিরানা মাঙনেসে নহি মিলতা, রেজাই মাঙনেসে নহি মিলা, গন্দা চাদর বদলায়া নহি যাতা, বাথরুম সাফ করনেকো বোলা তো কহা কি সফাই নহি হোগী-! অর আপ সার্ভিসকি দাওয়া কর রহে হেয়?"

"আপকে ম্যানেজার জিস রেটমে রুম লিয়া উসমে ইসসে জাদা কুছ নহি মিলেগা। এক্সট্রা চার্জ লগেগা"

"এক্সট্রা চার্জকি বাত আপ কহে রহে হেয়, পহেলে কিসিনে কিঁউ নহি বতায়া? অর কাপড়া হম বহারই দিয়ে থেঁ। বারিশকে কারণ অন্দর কী হেয়। কোই ধুলাইকে কে লিয়ে অ্যাভেলেব্‌ল নহি থা....." সপ্তর্ষি মুখ খুলল। এঁড়ে তার্কিক শেষে "ওকে ওকে" বলে বিদায় নিয়ে মা-বাবার ঘরে গিয়ে একই তম্বি করে গেল।

ভোর পাঁচটা বাজতে না বাজতেই ঘরে ঘরে দুম্ দুম্! "চেক আউট, চেক আউট। ঘর খালি কিজিয়ে.."

"চেক আউটকা সময় তো দোপহর বারা বজে হেয়। আভি কিঁউ ?"

ম্যনেজার কোথায়? অভিজিৎ কোথায়? হৈচৈ! দুম্ দুম্! "আভি খালি করো"...। যাঃ! বিদ্যুৎ চলে গেল। না পাশের হোটেলগুলোতে তো আছে। শুধু ইরামে নেই। পাওয়ার কেটে দিয়েছে। আর কত অসভ্যতা সইতে হবে চলে যাবার ঘণ্টাখানেক আগেও !?

রহস্যটা পরিস্কার হল গৌসিয়ার চত্তরে খেতে গিয়ে। অভিজিৎ বোস পরের বুকিংটা গৌসিয়া থেকে বাতিল করেছে। এসব তারই প্রতিক্রিয়া। আজ গৌসিয়ার আসল মালিক শমীম হাজির। দাঁত কিড়মিড় করল, "ডার্টি বেঙ্গলি!"

"হোয়াট হ্যাভ ইউ সেইড? ইউ আর ফেড বাই আস। হাম আনা ছোড় দে তো আপকা রোজি রোটি বন্ধ হো জায়েগা.." গর্জে উঠল সপ্তর্ষি।

"মেয়নে আপকো নহি কহা। আপলোগোকা কিচেন স্টাফ বহুত গন্দা হেয়। হাম যাঁহা রসুই করতে ওঁহা জুতা পহনকর নহি যাতে। এক পার্টি আয়া থা – উসকে কিচেন স্টাফ যাঁহা পর খানা বনায়া রাত কো, ওঁহি ড্রিংক কিয়া, পিসাব কিয়া – হামারা কার্পেট গন্দা কিয়া। মেয়নে প্রোটেস্ট কিয়া। আফটার অল হমারি প্রপার্টি।"

"উসে দেখকর হর বাঙ্গালিকো কেয়সে ডার্টি কহে সখতে আপ? অগর আপকো দেখতে হুয়ে হাম ইয়ে কহে, কি হর কশ্মীরি দগাবাজ হেয়, খরাব হেয়, ঝুটে হেয় তো ?"

শমীম চুপ করে গেল। একে ভরা মরশুম, তার ওপর ভারত সরকার ১৮জুন পর্যন্ত সব শ্রেণীর সরকারি চাকুরের জন্য দিল্লী থেকে শ্রীনগর অব্দি বিমান ভাড়া মঞ্জুর করেছে বলে মলমূত্র ভরা ডাললেকের আশপাশ কলকাতার অষ্টমীর রাত হয়ে রয়েছে। অফসিজনে এই বোসেরাই ব্যবসা বজায় রাখে। সদ্য তার কাছ থেকে দাওয়াই পেয়েছে।

ওদিকে শম্পার "চার আখবারোমে লিখতি হুঁ মেয়। আপকে মেহমান-নওয়াজিকা জিকর জরুর করুঙ্গী" শুনে ইরামের নতুন চোখ রাঙানো মালিক খুরশিদ "ম্যাডাম ম্যাডাম, গুস্সা থুক দিজিয়ে ... স্যার স্যার" করেছে বেরিয়ে আসার আগের আধঘণ্টা। এই নরকভোগের শেষে একটা ফাঁকা আওয়াজের বিনিময়ে এইটুকু খোশামোদ বেশ উপভোগ করছিল শম্পা। অবশ্য জানে না পহেলগাঁমে গিয়ে বোস একই রকম বেইমানির গল্প শোনাবে কিনা। একেও তো বিশ্বাস করা কঠিন। তাই দুর্ভোগের শেষ ভাবতে ভরসা হচ্ছিল না।

গৌসিয়ার উঠোনে খাওয়ার জায়গার পাশেই আবর্জনার দুর্গন্ধময় ড্রাম। তারই মধ্যে ব্রেকফাস্ট সারছে সব হাঁস্-হাঁস্ করে। বাঙালী সত্যিই 'ডার্টি'। এত হ্যাংলামো ভূস্বর্গ দর্শনের?

পুরোনো বোর্ডাররা একে একে ঘর ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে পিলপিল করে ঢুকছে নতুন নতুন উন্মাদের দল। বেশিরভাগই "ডার্টি বেঙ্গলি"!

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ মামাবাড়ির শহর মেদিনীপুরে, আর পৈতৃক বসবাস সূত্রে শেকড় পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার ডিশেরগড় খনি অঞ্চলে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (রসায়ন), বিএড, এমবিএ-র পর কর্মজীবন শুরু একটি ফার্মাসিউটিকল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসাবে। পেশাজীবনে অনেক আলো-আঁধারি পেরিয়ে ২০১০ সাল থেকে লেখালিখির জগতে থিতু। বর্তমানে একাধিক বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটদের গল্প, ছড়া, ফিচার, সমালোচনা ইত্যাদি রচনায় নিয়মিত। কয়েকটি ওয়েবসাইটে ফ্রিল্যান্স কনটেন্টও লিখেছেন। কবিতা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও গদ্যসাহিত্যে ব্যাপ্তি অধিকতর। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ শ্রীপর্ণার অন্যতম অনুরাগ ও দায়বদ্ধতার জায়গা। তবে এযাবৎ সাহিত্য-স্বীকৃতিগুলি এসেছে মূলত ছোটগল্পের জন্যই। স্বীকৃতি বলতে – বঙ্গ সংস্কৃতি পুরস্কার ২০১২, ঋতবাক 'এসো গল্প লিখি পুরস্কার' ২০১৬-১৭, শর্মিলা ঘোষ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬ (গল্প), উষা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮, নবপ্রভাত রজতজয়ন্তী বর্ষ সাহিত্য সম্মাননা ২০১৮ (গল্পগ্রন্থ)।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

STC টুর্নামেন্ট – Pass out parade – পোস্টিং

পর্ব ৩

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাতই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ তৃতীয় পর্ব।

এক নম্বর TTR এ অনেক কোম্পানি আছে। আমাদের RM company তে পোস্টিং হলো। ওই কোম্পানির ওসি ছিলেন একজন মাদ্রাজি। ক্যাপ্টেন জি. শিলাদুরাই। তিন চার দিন কাটার পর সন্ধ্যায় রোলকলে অর্ডার হলো, যারা ফুটবল খেলতে চায় তারা যেন ফুটবল মাঠে হাবিলদার থমাসকে রিপোর্ট করে। পরে জানতে পারি ক্যাপ্টেন শিলাদুরাই সাহেবও ওখানে থাকবেন। তখন খেলার ভীষণ নেশা। ঠিক সময়ে গ্রাউন্ডে চলে গেলাম। বোধহয় একশ-দেড়শ ছেলে গেছে ওখানে। বাইশ জন করে বেছে, দুটো করে টিম করে, কুড়ি-পঁচিশ মিনিট করে খেলাচ্ছে। এই ভাবেই চলছিলো খেলোয়াড় বাছাই। ওই দিন রোলকলে আবার আমার এবং আরো কিছু ছেলের নাম পড়ে শোনাল। আমরা যেন আগামীকাল আবার ওই মাঠে হাবিলদার থমাসকে রিপোর্ট করি। পরদিন গিয়ে দেখি, আজ মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন ছেলে গেছে। এই ভাবেই প্লেয়ার সিলেকশন চলতে থাকলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েকবার বসলো, মানে মাঠের বাইরে পাঠালো, আবার ডেকে নিল। ওই দিন আমরা কজন চার-পাঁচবার মাঠের বাইরে ও ভিতরে হতে থাকলাম। দিন দুই পরে রোলকলে আমার এবং আরো কিছু ছেলের নাম পড়ে শোনাল। এরা সকলে সেন্ট্রাল ফুটবল টিমের সুযোগ পেয়েছে। অর্ডার হলো, প্রত্যেকে স্পোর্টস স্টোরে গিয়ে ফুটবল বুট ও অন্যান্য জিনিস যেন ড্র করে। শুনলাম STC (Signal Traning Center) টুর্নামেন্ট শীঘ্রই শুরু হবে। ক্যাপ্টেন জি. শিলাদুরাই আমাদের টিম ক্যাপটেন। উনি আবার আমাদের কোম্পানির ওসি। আমাদের জন্য অর্ডার হলো, কোন নাইট ডিউটি আমাদের দিতে হবে না। সকালে নটা পর্যন্ত খেলা। পিটি, প্যারেড এ আমাদের যেতে হতো না। নটার পর মেসে আমাদের টিফিন রাখা থাকতো। সকালে চারটে করে লুচি দেওয়ার কথা, কিন্তু প্লেয়ারদের জন্য আলাদা ব্যাপার। যে যত পারে খাবে। আমরা সাত-আটটা লুচি জলখাবারে খেয়ে নিতাম। রাত্রে আমাদের এক্সট্রা দুধ দেওয়া হতো। দশটায় যে চা-পকোড়া দেওয়া হতো, সেটা খেয়ে আমরা ট্রেনিং ব্লকে চলে যেতাম। সারা দিনে সাড়ে দশটা থেকে একটা পর্যন্ত আমাদের ট্রেনিং হত। বিকালে আবার বুট ঘাড়ে করে মাঠে চলে যেতাম। আমাদের মত হকি, বাস্কেটবল ও ভলিবল টিমও ছিল। নিজেদের বেশ ভিআইপি মনে হতো। আমাদের, মানে প্লেয়ারদের সকলে একটু ভালো চোখে দেখতো। কেউ কেউ একটু হিংসাও করতো আবার। কিন্তু কিছু বলতে পারতো না আমাদের। কারণ যেহেতু ক্যাপ্টেন শিলাদুরাই আমাদের টিম ক্যাপ্টেন, আবার জগ কোম্পানির ওসিও বটে। এই খেলার জন্য আমাদের ট্রেনিং এর অনেক ক্ষতি হতো। অন্য সব ছেলেরা দিনে ছঘণ্টা টেকনিক্যাল ট্রেনিং করত, আর আমরা প্লেয়াররা মাত্র আড়াই ঘন্টার ট্রেনিং করতাম। প্রতিদিনই আমাদের এই ক্ষতিটা হতো। আমরা পিছিয়ে পড়ছিলাম। একদিন হাবিলদার থমাস স্যারকে বললাম এই ব্যাপারটা। উনি শুনে হাসতে হাসতে বললেন কোন চিন্তা করো না, তোমাদের পাস করার কোন অসুবিধা হবে না। পাস হয়তো করে যাব, কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারব না, তার কি হবে ? তার উত্তর কিন্তু পাইনি। একদিন একটা ঘটনা ঘটেছিল, একটু বলি। আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট চলছিল। কোন একটা ওয়্যারলেস সেট এর পরীক্ষা। এক এক করে ডেকে ওই সেট

টিউনিং নেটিং ইত্যাদি আরো অনেক রকম পরীক্ষা। হঠাৎ দেখলাম, ওসি শিলাদুরাই এসে আমাদের যে ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন তাকে হুকুম দিলেন – আমাদের স্পেশাল মেডিকেল টেস্ট হবে, তার জন্য আমাদের যেন এখনই ছেড়ে দেওয়া হয়। কোন টুর্নামেন্ট এর আগে স্পেশাল মেডিকেল টেস্ট হওয়ার নিয়ম। ওসি তো হুকুম করে চলে গেলেন আর ইনস্ট্রাক্টরও তখনই "ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার" – বলে ওঁনার পিছন পিছন এগিয়ে গেল। ফিরে এসে বললেন, তোমরা গও (মেডিকেল ইনফরমেশন) room এ চলে যাও। আমার সঙ্গে "উবু" বলে আরো একজন ছিল। আমরা বললাম – "স্যার আমাদের পরীক্ষার কি হবে ?" উনি প্রচন্ড রেগে গালাগালি দিয়ে বললেন, "যাও, তোমাদের বাপ আছে, কে ফেল করাবে তোমাদের ?" এই ভাষাটাই বলেছিলেন সেদিন। যেহেতু টিম ক্যাপটেন আমাদের ও সি, আমাদের ফেল করার কোন ভয় নেই। আমরা ভিআইপির মতো ট্রেনিং ক্লাস থেকে MI room এর পথে রওনা দিলাম। ওখানে টিমের সকলের সাথে দেখা হল। সেন্ট্রাল টিমের সব প্লেয়াররা সকলে এক জায়গায় থাকে না, বিভিন্ন ট্রেডের ছেলে বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং করে। বিকেলে খেলার মাঠে প্রতিদিনই দেখা হয়, খেলার জন্য ওয়ারলেস সেট এর ট্রেনিংটা ঠিকমতো পাচ্ছি না। পাশ করে যাবো, কিন্তু ওটা তো আমাদের ক্ষতি। পরে ভুগতে হবে। খেলার জন্য খুব মজায় কাটছে। আড়াইঘন্টার ট্রেনিং-এ ব্লক থাকা বাদ দিয়ে আমাদের আর কিছু করতে হয় না। ওখানে দুটো টুর্নামেন্ট হয়। একটা শুধু রিক্রুটদের মধ্যে, আর একটা রিক্রুট এবং পার্মানেন্ট স্টাফ একই টিমে খেলে। রিক্রুট ও ওখানকার স্থায়ী স্টাফ একসাথে খেলাটায় মজা বেশি। এইটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভীষণ হই হই হয়। দেখতে দেখতে STC টুর্নামেন্ট এসে গেল। দুবেলা প্রাকটিস চলছে। অনবরত ভাষণ দিচ্ছে, "এটা একটা সম্মানের লড়াই, যেভাবে হোক জিততেই হবে"। আমরা এক নম্বর TTR টিমে খেলতাম। খেলার জন্য ওখানকার সব বাঙ্গালীদের সাথে মুখ চেনা হয়ে গেছিল। রাত্রে জব্বলপুর শহরে ঘুরতে যেতাম। রাস্তায় অন্য টিমের প্লেয়ারদের সাথে দেখা হতো। খেলা আরম্ভ হল। আমাদের এক নম্বর TTR এর টিম একটার পর একটা ম্যাচ জিতে এসে STC টুর্নামেন্ট জিতে নিলো। খুব গর্ব হতো এই ভেবে যে, আমিও ওই জেতা টিমের সদস্য। অফিসাররা সাধারণভাবে আমাদের মতো other rank এর ছেলেদের সাথে ভালোভাবে কথা বলে না। ওরা অন্য জাতের লোক। কিন্তু খেলার জন্য সব অফিসাররা আমাদের ভালোভাবে চিনে গিয়েছিল। কোন জায়গায় দেখা হলে ডেকে কথা বলতো। তাতেই আমরা যেন ধন্য হয়ে যেতাম।

খেলা শেষ, এবার ট্রেনিং এর উপর জোর পড়েছে। এতদিন যে জিনিস জানতাম না, সেগুলোর ওপর আলাদা জোর দিয়ে আমাদের শেখানো হতো। বেশ ভালো লাগত। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সাথে কেমন করে যোগাযোগ করতে হয়, সেসব শেখানো হতো। কন্ট্রোল থাকতো এক জায়গায়, আরো পাঁচ-সাতটা বা দশটা ওয়ারলেস সেট অন্য জায়গায় থাকতো। কন্ট্রোলকে একটা ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হতো। সে ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে নেটিং কল দিতে থাকতো, আর অন্য স্টেশনরা মানে অন্য সেট ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট টিউন করে নেট করে নিতো। বেশ ভালো লাগত ব্যাপারটা। আমাদের সময়ে ভারতের তৈরি হাই পাওয়ার ওয়ারলেস সেট বলতে, সিমেন্স ১ কিলোওয়াট, সিমেন্স চারশো ওয়াট, C-৯, C-১১ এইসব সেট ছিল। এই সেটগুলো সব ব্যাঙ্গালোরে তৈরি। আর একটা বড় ট্রান্সমিটার ছিল, নামটা মনে আছে, SWB-8X ট্রান্সমিটার। তার আউটপুট ছিল পাঁচ কিলোওয়াট। কিন্তু কোথাকার তৈরি, এখন আমি তা ভুলে গেছি। হিন্দুস্তান টেলিপ্রিন্টার এর ট্রেনিং হত। ওই টেলিপ্রিন্টারের কিবোর্ড এখনকার কম্পিউটার বা ল্যাপটপের কিবোর্ড এর মতো, একই। এতদিন পরে নিশ্চয়ই আরো উন্নত মানের সেট বা আরো হাই পাওয়ার সেট, যার আউটপুট অনেক বেশি সেই রকম ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করা হয়। এখন খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আরো অনেক উন্নত মানের কমিউনিকেশন পদ্ধতি চালু হয়েছে মিলিটারিতে। যতদিন যাবে স্বাভাবিকভাবেই উন্নতি হতে থাকবে। আর একটা ট্রেনিং হত। ৪ জনের একটা টিম থাকতো। ওই চারজন একটা ট্রান্সমিটারের সাথে থাকবে। কোন একটা জায়গায় পৌঁছে কত তাড়াতাড়ি অন্য একটা জায়গার সাথে সেটটা কানেক্ট করতে পারবে তার ট্রেনিং। প্রথমে তাড়াতাড়ি এরিয়াল টাঙ্গাতে হবে। ওইটাই সেই সময় আসল কাজ। ওই চারজনের আলাদাভাবে কাজ ভাগ করে দেওয়া থাকত। কে কি করবে আগেই জানানো থাকতো। একটা বাঁশি বাজার সাথে সাথে আমরা দৌড়ে দৌড়ে কাজ করতাম। কাজ শেষ হলেই আমরা জানিয়ে দিতাম আমরা তৈরি।

লক্ষ্যটা হলো, কত কম সময়ে কানেকশন করা যায়। ওয়ারলেসে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটাও শেখানো হতো। সাধারণভাবে ওটা অপারেটরের কাজ। কিন্তু আমাদেরকেও একটু শিখতে হয়েছিল। অনেক রকম পদ্ধতি ছিল। যেমন – RT (Radio Telephony) এতে টেলিফোনে যেভাবে কথা বলি সেইভাবে কথা বলতে হয়। এইভাবে CWC (Continous Web Communication), এতে key স্ট্রোক করে করে টরে টক্কা, যেটা আমরা রেলওয়ে স্টেশনে কিংবা কোন টেলিগ্রাফ অফিসে দেখেছি সেভাবে কথা বলতে হতো। CWC টা সম্পূর্ণ সাংকেতিক ব্যাপার। সকলে বুঝতে পারবে না কি বলছে। এছাড়া সাইফার অপারেটরদের একটা বিশেষ ট্রেনিং হতো। একেবারে বন্ধ ঘরে ট্রেনিং হত। এতই গোপন ব্যাপার যে, ট্রেনিং ব্লক থেকে কোন বই, খাতা বা কোন নোট ব্যারাকে আনতে পারবে না। এতই কড়া আইন ছিল ওখানকার যে, ট্রেনিং সম্বন্ধে নিজের বাড়িতে বা কোন বন্ধুকে এমন কি অন্য মিলিটারির লোককেও ওই ট্রেনিং সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না। আমি নিজে মিলিটারীতে চাকরী করেও সাইফার অপারেটরের কোন ব্যাপার জানতে পারিনি। খুবই গোপন ব্যাপার। এতই গোপন, ছুটিতে গেলে সাইফার অপারেটরদের পিছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত। যদিও এটা আমার শোনা কথা। কতটা সত্যি জানিনা।

এক নম্বর TTR এর ওয়ারলেস সেটের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসটা আমার খুব ভালো লাগত। এতে কঠিন কঠিন ইলেকট্রনিক থিয়োরি, যেটা আমার একেবারেই পছন্দের জিনিস নয়, সেসব পড়তে হতো না। আসলে বুঝতে পারতাম না ওই সব কঠিন পড়া। কিন্তু প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে হাতে কলমে সেটগুলো টিউন করা বা একটা সেট থেকে অন্য আরেকটা কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে সেই সব শেখানো হতো। ওগুলো বুঝতে কোন অসুবিধা হতো না। আমাদের ট্রেনিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ট্রেনিং শেষ হলেই পাস আউট প্যারেড হবে। তারপর আবার এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে অন্য কোন ইউনিট, মানে রেজিমেন্টে পোস্টিং হবে। কোথায় হবে কে জানে ? এতদিন একরকম কাটছিল। অন্য জায়গায় গিয়ে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তাই ভয় হয়, পারব তো ? তবে একটা আনন্দের ব্যাপারও আছে। ট্রেনিং শেষ হলে আমাদের আবার ছুটি পাওয়া যাবে। তাই মন থেকে চাইছিলাম ট্রেনিংটা শেষ হোক। আমরা বাড়ি যাই। দেখতে দেখতে সেই দিনটা প্রায় এসে গেল। আমাদের নোটিশ দেওয়া হলো, এত তারিখ থেকে আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা নেওয়া হবে। সাধারণভাবে কাউকে ফেল করায় না। তাহলেও পরীক্ষা এমনই একটা জিনিস, নাম শুনলে একটু ভয় তো লাগেই। আস্তে আস্তে সেই দিন এসে গেল। এক এক করে পরীক্ষা নেওয়া আরম্ভ হল। প্রথমে সব থিওরি পরীক্ষা হলো। তারপর প্র্যাক্টিকাল টেস্ট নেওয়া হলো। দশ-বারো দিনের মধ্যে সব শেষ। আমরা তখন ছাড়া গরুর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। খেলাও নেই, আর পড়াও নেই। আমাদের নিয়ে উল্টোপাল্টা সব কাজ করাতো। গ্রাউন্ডের ঘাস পরিষ্কার করা, নালা পরিষ্কার করা, ঝোপঝাড় কাটা, এসব কাজ। বসিয়ে রাখবে না। আনন্দের সঙ্গেই করতাম। কারণ জানতাম এবার আমরা ছুটি পাব। বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। চার থেকে ছয় দিনে আমাদের পরীক্ষার ফল বের হল। আমরা সকলে পাস করে গেলাম। এবার পাস আউট প্যারেড হলো। আমরা সকলে রিক্রুট থেকে সিগন্যালম্যান হলাম। আগে "রিক্রুট চট্টোপাধ্যায়" বলতো। এখন "সিগন্যালম্যান চট্টোপাধ্যায়" হলাম। আপাতত ট্রেনিং সেন্টারের জীবন শেষ হল। এখন আমরা ক্লাস থ্রি RM (Radio Mechanic) হিসেবে গন্য হলাম।

আমাদের সকলকে ছুটিতে পাঠানো হলো। ছুটি শেষ করে আসার পর আমাদের বিভিন্ন ইউনিটে মানে অন্য কোন এক্টিভ রেজিমেন্টে পোস্টিং করা হবে। আমরা বাড়ি যাবার জন্য বোম্বে মেল ভায়া এলাহাবাদ এ চড়ে বসলাম। অবশ্য যারা কলকাতা যাবে তারাই। অন্যরা অন্যান্য ট্রেন ধরলো। কি আনন্দ বলে বোঝাতে পারবো না। মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় উড়ছি। আরও একটা কারণ – রিক্রুট অবস্থায় যা টাকা পেতাম এখন সিগন্যালম্যান হয়ে একটু বেশি পাব। এখন আমরা পুরো সোলজার হয়ে গেছি। বাড়িতে জানিয়েছিলাম বাড়ি যাচ্ছি বলে। তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না। চিঠিতে সব যোগাযোগ হতো। ঠিক সময় বাড়ি পৌঁছালাম। মনে হচ্ছে আমার থেকেও বেশি খুশি আমার বাবা-মা। সেই বাড়ি, সেই গোপালনগর গ্রাম। বেশি দিনের ছুটি নয়, মাত্র আটাশ দিন। যাক তবুও তো আমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হলো। বাড়ির

সকলের সাথে তো বটেই। গ্রামের বন্ধুদের সাথে দেখা হলে ভাল লাগে। বৈকালে স্কুল গ্রাউন্ডে খেলতে যাওয়া, খেলার পরে স্কুলের দুয়ারে বসে গল্প করা, আর মাঝে মাঝে বাইরে কোন খেলা থাকলে খেলতে যাওয়া। এই ভাবেই কাটছিল। বাবা বোধহয় আগের থেকে একটু সহজ হয়েছেন। রাগটাও একটু কমেছে। চাকরির জন্য মিলিটারিতে চলে যাওয়াটা বাবার একেবারেই পছন্দ হয়নি। সেই জন্য আমার উপর খুব রেগে ছিলেন। মা আমাকে একটা নাইলনের মশারি কিনে দিতে বলেছিল। এসেই বাবাকে টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কাছে যা সামান্য টাকা ছিল, সেই টাকা থেকে মাকে একটা মশারি কিনে দিয়েছিলাম। এর আগে বাড়িতে সকলেই সুতির মশারি ব্যবহার করত। মা খুব আনন্দ পেয়েছিল। মাঝে দিদিদের বাড়ি গিয়ে সকলের সাথে দেখা করে এসেছিলাম। যদিও ছোটদির তখনো বিয়ে হয়নি। ছোটদি তখন তমলুক থেকে BA পড়ছিল। দাদারা বাবা-মাকে দেখার জন্য যখন বাড়িতে আসতো তখন আমার সঙ্গে দেখা হতো। মেজদা, সেজদা কলকাতায় আলাদা বাসা নিয়ে থাকে। ছোটদা ইতিমধ্যে গ্রামে একটা তৈরি বাড়ি কিনে চলে গেছে। যদিও আমাদের মূল বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয়। বাড়ীতে তখনও বড়দা-বড় বৌদি আর ওদের ছেলেমেয়েরা থাকে। ওরাও হয়তো নিজেদের সুবিধার জন্য কবে বাবা মাকে ছেড়ে চলে যাবে। বাবার এত বয়স হয়ে গেছে। মা চোখে দেখতে পায় না। ভবিষ্যতে হয়তো রান্নার জন্য রাঁধুনি রাখতে হবে। "দাদা"-র এখনো বিয়ে হয়নি। আস্তে আস্তে ছুটি শেষ হয়ে আসছে। ছুটি যত শেষের দিকে চলে আসে ততই মন খারাপ হয়ে যায়। প্রতিদিনই দিন গুণতে থাকি, আর কতদিন আছে। আমার মন খারাপের সাথে বাবা মার খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

এবার ছুটি শেষ হয়ে গেল। আবার বোম্বে মেলে জব্বলপুর চলে গেলাম। জব্বলপুর থেকে কোথায় আমার পোস্টিং হবে জানিনা। তবে আট-দশ দিনের মধ্যে সকলের পোস্টিং হয়ে যাবে। সেই অপেক্ষায় আছি। কয়েক দিনের মধ্যে সকলের পোস্টিং এসে গেল। আমার মিলিটারি জীবনে প্রথম পোস্টিং হলো ফার্স্ট Armourd division, Signal regiment এ। সেই সময় ফার্স্ট armourd ডিভিশন ঝাঁসিতে ছিল। জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ। এবার ঝাঁসি, উত্তরপ্রদেশ। এইবার কয়েক বছর অন্তর অন্তর বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে হবে। ফার্স্ট Armourd division, Signal regiment এ new arrival সেকশনে আছি এখন। নতুন কেউ এলে new arrival-এ থাকে। তারপর অন্য জায়গায় পোস্টিং হয়। ছুটির দিনে আমরা কয়েকজন আউট পাস নিয়ে ঝাঁসি বেড়াতে গেলাম। রানী লক্ষ্মীবাঈ এর দুর্গ দেখলাম। দুর্গ থেকে ঘোড়ায় চেপে ছেলে নিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে ছিলেন। সেই জায়গাটা এখনো আলাদা করে চিহ্নিত আছে। দুর্গের বিশাল বিশাল কামান রাখা আছে। আরো কয়েক জায়গায় ঘুরে, দুপুরে বাইরে খেয়ে নিলাম। এদিক ওদিক ঘুরে সন্ধ্যের আগে ফিরে গেলাম। এখানে রাখবে, না অন্য কোন কোম্পানিতে পাঠাবে কে জানে ? একটা রেজিমেন্টে চারটে কোম্পানি থাকে। সেগুলো রেজিমেন্টাল হেডকোয়ার্টার থেকে একটু দূরে দূরে হয়। নতুন কোন ইউনিট এ গেলেই ডকুমেন্টেশন হয়। মানে আমার ঠিকুজি তৈরি হয়। আমার বাড়ির খবর, আমার নিজের সব কিছু ইত্যাদি লিখতে হয়। সে সব কাজ শেষ হলো। কোথায় থাকলে ভালো হয় সেটাও বুঝতে পারছি না। বাইরে কোম্পানিতে গেলে ভালো হবে, না রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারে থাকা ভালো সেটাও বুঝতে পারছি না। বাড়িতে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, হয়তো অন্য জায়গায় পাঠাবে আবার। কয়েকদিনের মধ্যে একজন নতুন ওয়ারলেস অপারেটর আর আমি মানে একজন রেডিও মেকানিক, আমাদের দুজনকে "ববিনা" তে পোস্টিং করে দিল। ববিনা ঝাঁসি থেকে খুব দূরে নয়। সিগনাল কোম্পানি আছে সেখানে। আমাদের বর্তমান ঠিকানা হলো ববিনা। এখানে একটা সুবিধা, টেকনিক্যাল কাজটা বেশী পাওয়া যাবে। আমার মেকানিক সেকশনে পোস্টিং হলো আমার সাথে যে অপারেটর এসেছিল তার অপারেটর সেকশনে পোস্টিং হলো। এখানে কিছুদিন কাজ করে বুঝলাম, কাজের দিক থেকে এই জায়গাটা ভালো। সেটের কাজ পাওয়া যাবে। ফালতু হাবিজাবি কাজ কম। এই সিগন্যাল কোম্পানিতে C-১৯, C-১১ আর ট্রান্সমিটার ছিল সিমেন্স ৪০০ ওয়াট। নতুন গেছি, সিনিয়র মেকানিকদের কাছ থেকে কাজ শিখতে লাগলাম। ভালো লাগছিল এসব কাজ। বিকেলে নানা রকম খেলা হতো। কখনো ফুটবল, কখনো বা ভলিবল খেলতাম। কয়েকজন বাঙালি ছিল পুরো কোম্পানিতে। সন্ধ্যার পর রাত্রে খাবার খেয়ে বাইরে ঘুরতে যেতাম। বাড়িতে সময় করে চিঠি লিখতাম বাবা মাকে মা। আবার আমাকে বাবার সাথে চিঠি দিত মা। খুব ভালো লাগতো মায়ের হাতের লেখা চিঠি পেয়ে। এখানে

দু-তিনজন কেরালার ছেলে ছিল। তারা সকলে এখানকার পুরনো স্টাফ। তাদের দাপটও একটু বেশি ছিল। F of S (ফোরম্যান অফ সিগন্যাল) এর সঙ্গে ওঠাবসা ছিল। আমি যে সিগন্যাল কোম্পানিতে পোস্টিং হয়েছি, সেটা আবার ফার্স্ট আর্মার্ড ডিভিশনের আন্ডারে। এখানে আলাদা আলাদা কোম্পানি আছে এবং এই বিগ্রেডের তিনটে আর্মার্ড ইউনিট আছে। এই তিনটি ইউনিটের সিগন্যাল কমিউনিকেশন এর দায়িত্ব আমার। আমাদের সিগন্যাল কোম্পানির তিনটি ইউনিট ছিল, 4 Horse, 17 Horse Avi 16 Light Cavalry। তিনটে আর্মার্ড ইউনিটে সেঞ্চুরিয়ান ট্যাংক, আর C-19, C-11 ওয়ারলেস সেট ছিল। সব ট্যাংকের ওজন ছিল ৫০ টন। নতুনদের সাধারণভাবে ওইসব ইউনিটে পাঠায় না। কারণ ওখানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয় মেকানিকদের। এখানে "F of S" আছে, অনেক সিনিয়র মেকানিক আছে। সকলে মিলে কাজ করে। সেই জন্য অসুবিধা হয় না। আমি চাইছিলাম কোম্পানিতে থেকে কাজ শিখে তারপর বাইরে গেলে ভালো হয়। দু তিনজনকে বলেছিলাম যাতে এই সময় আমাকে বাইরে না পাঠায় সেটা লক্ষ্য করতে। কারণ এই পোস্টটা "F of S" এর হাতে থাকে। "F of S" এর সাথে ওই সিনিয়র মেকানিকদের ওঠাবসা অনেক বেশি আমার থেকে। দেখা যাক কি হয়। ওই ইউনিটে কিছুদিন এইভাবে কেটে গেল। পুরনো লোকদের সাথে থেকে কাজ শেখার চেষ্টা করছিলাম। ভালোই কাটছিল। হঠাৎ খবর এলো 16 Light Cavalry র একজন মেকানিকের আপগ্রেডিং এর জন্য নাম এসেছে। তাকে ছয়-সাত মাসের জন্য জব্বলপুর কিংবা গোয়া যেতে হবে। সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার জব্বলপুরেও যেমন আছে তেমন গোয়াতেও আছে। ওখানেও নানা ধরনের ট্রেনিং হয়। জব্বলপুর হলো একনম্বর সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার, আর গোয়া হলো দুই নম্বর সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার। ও যে কোন এক জায়গায় যাবে। ক্লাস থ্রি রেডিও মেকানিক থেকে ক্লাস টু করার জন্য বা ক্লাস টু রেডিও মেকানিক থেকে ক্লাস ওয়ান করার জন্য কোন না কোন ট্রেনিং সেন্টারে যেতে হয় সকলকে। ওই জায়গায় আমার পোস্টিং করা হলো। আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম, নতুন গিয়ে কি করে কাজ সামলাবো। আমাকে আশ্বাস দেওয়া হলো, ওখানে ৬ জন ভালো মেকানিক আছে, কোন অসুবিধা হবে না কাজের। ১৬ ক্যাভেলরী ববিনাতেই ছিল বেশি দূর যেতে হলো না। এবার ১৬ ক্যাভ্যালরীতে সিগন্যাল সেকশনে পোস্টিং হলো। ওই ইউনিটটা পুরো সাউথ ইন্ডিয়ান রেজিমেন্ট ছিল। যদিও আমাদের সিগন্যাল সেকশনে বিভিন্ন জায়গার লোক আছে। কোন বাঙালি কিন্তু নেই। ওই ইউনিটে মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ্র আর মহীশূর এই চারটে জায়গায় লোক ছিল। তখন ওইরকমই নাম ছিল, তাই এইভাবে লিখলাম। আমাদের সেকশনে রেডিও মেকানিক, অপারেটর আর ড্রাইভার এই তিনটে ট্রেডের লোক ছিল। আর ওই ইউনিটে EME (Electrical Mechanical Engineering) র বেশ কিছু লোক ছিল। তারা ট্যাংক, B vehicle, মানে তিন টন, এক টন জিপ এইসব গাড়ির মেরামতির ব্যাপারটা দেখাশোনা করতো। আমরা শুধু ওয়ারলেস সেট এর দেখাশোনা করতাম। EMEতে কয়েকজন বাঙালি ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। 16 Light Cavalry এর লোকেরা সকালে দু'বেলা ভাত খেত। আমরা দুপুরে ভাত ও রাত্রে রুটি খেতাম। দক্ষিণ ভারতীয় খাবার আমার তো ভালোই লাগতো। একটু বেশি টক খেত ওরা। মাংসতেও টক খেত। আমার খারাপ লাগত না যদিও। মাস দুই থাকার পরে আস্তে আস্তে "16 Light Cavalry" ইউনিটটাকে ভালোবেসে ফেললাম।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

মৌসুমী রায়

বেনারসের ডায়রি

পর্ব ৩

(১০)

সারনাথ পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। গাড়ি থেকে নামতেই গায়ে যেন ফোস্কা পড়ার জোগাড়। ঘনঘোর শ্রাবণে বৃষ্টি তো দূর অস্ত এক টুকরো মেঘও চোখে পড়ছে না। একটা বিশাল বট গাছের নীচে রেস্টুরেন্ট। যেন জায়গাটার সাথে সাযুজ্য রেখেই বানানো। আরামদায়ক যান্ত্রিক ঠান্ডা, শান্ত পরিবেশ। এদিকে ঘড়ির কাঁটা ছুটছে। দেখার এখনও অনেকটাই বাকি। চটপট লাঞ্চ সারলাম। দেহ আর পেটের আরামে ঝিমিয়ে পড়া শরীর এখন বেশ চাঙ্গা।

(১১)

বাইরে আসতেই দেখি আমাদের চালক ভাই এক জন গাইড নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষায়। একশো টাকায় রফা হলো। রফা না বলে বলা ভালো জবরদস্তি সাথে জুড়ে দেওয়া হলো। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকেই থাই টেম্পল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন। সুসজ্জিত এই মন্দিরটি তৈরি হয় ১৯৩৩ সালে। নানা মাপের নানা মুদ্রার বুদ্ধের মূর্তি পুরো অঞ্চল জুড়ে। সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালে, এই সারনাথেই গৌতম বুদ্ধের পাঁচ অনুগামী সর্বপ্রথম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। থাই টেম্পলের অনতিদূরে সেই বিশেষ স্থানটিকে পাথর আর ইঁটের গাঁথনি দিয়ে স্তূপ আকারে বাঁধিয়ে রাখা আছে। এই সারনাথ স্তূপার নির্মাণ শৈলীতে বৌদ্ধ যুগের ছাপ স্পষ্ট। এখানে দেখার সময় সাধারণত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। থাই টেম্পলে টিকিটের ব্যবস্থা না থাকলেও প্রাচীন সারনাথ স্তূপা দেখতে টিকিট লাগে। তাই সে ক্ষেত্রে পাঁচটায় টিকিট কাউন্টার বন্ধ হবার আগেই সেখানে পৌঁছনো চাই।

থাই মন্দিরটিতে বেশ বড়সড় লাফিং বুদ্ধার মূর্তি দেখে মেয়ে আর রিয়াঙ্কা বেশ উৎসাহিত। চলছে ক্যামেরার সামনে নানা রকম পোজ। DSLR হাতে কীর্তি সে সব আব্দার মেটাচ্ছে বলাই বাহুল্য। এদিকে গরমে আমার নাস্তানাবুদ অবস্থা।

গাইডের কথা কিছুই আর মাথায় ঢুকছেনা যেন। মুখে চোখে বোতলের ঠান্ডা জল ঢালছি বারবার। গাইড ভদ্রলোকটি যেন একটু বিরক্ত। আমাদের গা ছাড়া ভাব দেখে কিছু বলার চেষ্টা করেও যেন বলতে পারছে না। অবশেষে আমরা গাড়ির খোঁজ করতেই জানা গেল গাড়িটা একটা সমবায় সমিতির সামনে রাখা আছে। মন্দিরের পাশেই, মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। ভেতরে বেনারসি সিল্ক শাড়ীর বিরাট সম্ভার। আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে গাইড বাবু হাওয়া। বুঝেছে এই দলে মেয়েরাই সংখ্যায় বেশি, তো মার দিয়ে কেল্লা! সাথে গাইড জুড়ে দেবার আসল উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। ওখান থেকে কিছু কিনবোনা মনে মনে পণ করেও দুটো শাড়ি সেই কিনেই ফেললাম। তবে বেশ দর কষাকষির পর। সুনীলের তখন বদ্ধমূল ধারণা আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হয়েছে। আমার কিন্তু একদমই তা মনে হয়নি, যদিও তার সম্ভবনা ছিল প্রবল। বেশ ফুরফুরে মেজাজে গাড়িতে এসে বসলাম। যাই হোক, বেনারসে এসে প্রথম কেনার আনন্দে মনটা তখন বেশ খুশি খুশি।

(১২)

আমাদের এবারের দ্রষ্টব্য রাম নগর ফোর্ট। এদিকে কেনাকাটা করতে গিয়ে বেশ একটু দেরিই করে ফেলেছি। সারনাথ থেকে ফিরতি পথে কমবেশি ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। প্রায় তিরিশ বছর আগের দেখা এই দুর্গের একটা হালকা ছবি মনের মধ্যে গাঁথা। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মোঘল স্থাপত্যের আদলে গঙ্গার পাড় বরাবর হলুদ বালি পাথরে তৈরী এই দুর্গ নির্মাণ করেন কাশীর রাজা, রাজা বলবন্ত সিং। এর ঠিক উল্টো দিকেই তুলসী ঘাট। নৌকায় গঙ্গা পার করে গেলে দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যায় এই দুর্গটিকে। আমাদের এবারের যাত্রা গাড়িতে। বড়ো রাস্তার ওপরেই এর প্রধান ফটক। চারিদিকে দোকান বাজারের মাঝেই এর অবস্থান। দুর্গের ভেতরে সপারিষদ রাজা রানীর বাস। দোকান বাজার সেখানেও। ক্ষমতার গন্ডি সে যেমনই হোক, বেশ রূপকথার দেশের মতো মনে হয়। অযত্নে প্রবেশ দ্বার কিছুটা নিস্প্রভ হলেও, সামনে রাখা কামান দেখে বেশ গা ছমছম করে।সামনে দাঁড়িয়ে গায়ে হাত রাখলাম একটু। দু চারটে ছবিও তুললাম। সারাদিনের ক্লান্তি সাথে সময়ের চোখ রাঙানিতে খুব বেশিক্ষণ আর থাকা হলো না। রাজকন্যে দেখার সাধটা এবার মনেই রয়ে গেল।

(১৩)

বেনারসী শাড়ি তৈরি বেনারসের এক প্রাচীন শিল্প। যার নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে রাজকীয়তা। বহু মূল্যের এই শাড়ি কিভাবে তৈরী হয় তা দেখার আগ্রহ ছিলো প্রবল। শহরের এক প্রান্তে একটি অপ্রশস্ত গলির সামনে গিয়ে গাড়ি থামলো। ড্রাইভারের কথা মতো ওটাই বেনারসী মহল্লা। বাইরে থেকে দেখে বোঝার জো টি নেই। ভাবনার সাথে বাস্তবের এমন ফারাকে মনটা কোথাও যেন একটু দমে গেলো। গাড়ি থেকে নেমে গলিতে ঢোকার মুখেই একজন এগিয়ে এলেন। মাঝ বয়সী, ছোট খাটো চেহারা। আমাদের ড্রাইভার ছেলেটি পরিচয় করিয়ে দিল। তার সাথেই এগোতে লাগলাম। সরু অপরিচ্ছন্ন গলি। গলির দুদিকে সার দিয়ে ছোট ছোট ঘর গায়ে গায়ে লাগানো। কোনটায় মানুষের বাস আবার কোনটায় চলছে নানান কিসিমের বেনারসীর বুনন। খটাংখট আওয়াজ সমস্ত এলাকা জুড়ে। কয়েকটি ছোটো ছেলে মেয়ে গলি জুড়ে খেলা করছে। দু একটা ছাগল ছানাও সঙ্গী ওদের। আমাদের দেখে একটু যেন অবাক। খেলা বন্ধ রেখে আমাদের দিকে

তাকিয়ে আছে। ছবি তুলবো ভেবে ফোনটা হাতে নিতেই সবাই মিষ্টি হেসে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিষ্পাপ সরলতা মাখা কয়েকটি মুখ। দু একটা কথা বলে আবার এগোতে লাগলাম। গাইড ছেলেটির সাথে গিয়ে ঢুকলাম একটা ছোট্ট ঘরে। তার মাঝেই তিন চারটি হাতে চালানো মেশিন। রঙ বেরঙের রেশমি সুতোর রিল নিয়ে বসে এক কিশোর। তাঁতে বোনা হচ্ছে নানা রঙের নানা কোয়ালিটির শাড়ি, বেশ জটিল তার গঠন পদ্ধতি। আমরাও দেখলাম অপার বিস্ময়ে। শিখলাম সুতোর গুণমানের নানান ফারাক, বেশ যত্নের সাথে। এত মর্যাদাপূর্ণ বস্ত্র এমন অপ্রশস্ত জায়গায় কি অসম্ভব দক্ষতায় তৈরি হচ্ছে ভাবতে অবাক হতে হয়। ধর্মের সংকীর্ণতা পার করে মুসলিম কারিগরদের নিপুণ দক্ষতায় তৈরি হয়ে উঠছে আমাদের সকলের অবশ্য প্রয়োজনীয় বেনারসী শাড়ি যা কি না পুজোয় দেবীর পরিধান থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান সবেতেই অপরিহার্য। এক অদ্ভুত ভালো লাগা নিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসলাম।

(১৪)

এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন। ফেরার তাড়ার মধ্যেও ঘোর কাটছে না যেন। সকালে লম্বা লিস্টি বানিয়ে রাখলেও কেনাকাটা তেমন কিছুই হয়নি এখনও। তাই গাড়ির অভিমুখ এবার সোজা গোধূলিয়ার মোড়। ফিরতি পথে গঙ্গা পেরনোর সময় ব্রিজের ওপর থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে রামনগর ফোর্টটিকে। এই ব্রিজটা নতুন। আগের বার নড়বড়ে পন্টুন ব্রিজের ওপর দিয়ে অটোতে গিয়েছিলাম দুর্গ অবধি। সারি সারি পিপের ওপর একটা লোহার পাত পাতা, ঘটাং ঘটাং শব্দের সাথে বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটার নাচনে সে এক অস্থির কান্ড ! এখন বন্দোবস্ত বেশ পাকা। সেই গল্প করতে করতে কখন যেন পৌঁছে গেলাম প্রায় ৩০ বছর আগের স্মৃতিতে। গাড়ি থেকে যতক্ষণ দেখা গেল চেয়ে রইলাম দুর্গের দিকে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় তার গা দিয়ে যেন সোনা গলে মিশে যাচ্ছে গঙ্গার ঘোলা জলে। গোধূলির আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে তার চারপাশের পরিবেশ।

(চলবে)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

বই – চেনা

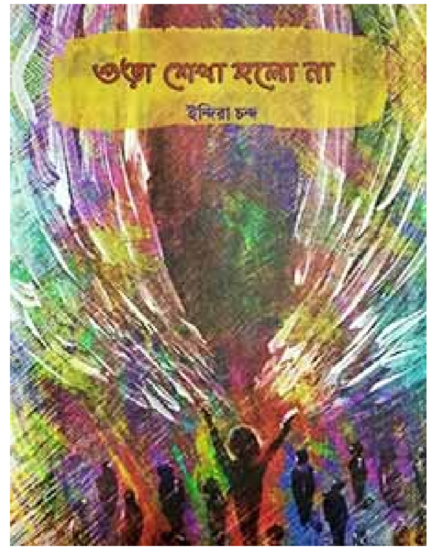

কবিতার বই : ওড়া শেখা হল না
কবি : ইন্দিরা চন্দ (পার্থ /অস্ট্রেলিয়া)
প্রকাশক : রেডিয়্যান্স (কলকাতা /ভারত)

সাদামাটা এক প্রচ্ছদের আড়ালে যে এমন একটা বিস্ফোরণ লুকিয়ে থাকতে পারে, – বইটা খুলে না দেখলে জানতে পারতাম না। বাঁদিকের পাতায় কবির নিজের হাতে আঁকা ছবি, অন্য পাতায় সেই ছবির সাদাকালো ছায়ার মাঝে লেখা কবিতা আদ্যন্ত পুরু এবং দামি পাতায় ছাপা বইটিকে একটি আলাদা মাত্রা দিয়েছে। কবিতা ও ছবি এই দুই বিমূর্ত মাধ্যমকে ব্যবহার করে, দুই মলাটের ভিতরে, ইন্দিরা উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতি ।

'সময়ের ওপারে / কত অগুনতি সূর্যধোয়া দিন / আর অফুরান চাঁদনী রাত' অথবা 'নিজের কাছে ফেরার নিরুদ্দেশ পাড়ি'র অভিজ্ঞতা এতদিন ধরে ঋদ্ধ করে চলেছিল কবির মনন। সামাজিক স্থবিরতা, অন্যায় বারবার আহত করে তুলছিল কবির হৃদয় আবার ভালোবাসা-বিরহে, আনন্দে-শোকে রাঙানো জীবনের উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর মনোজগৎ। আর সেসব কথাই উঠে এসেছে তাঁর কবিতার আন্তরিক ভাষ্যে।

যেমন, 'আমি ভয় করবো না', 'পুতুলনাচ', 'পর্দানশীন' প্রভৃতি কবিতায় লিখেছেন ভারতীয় নারীজীবনের চেনা ও চিরন্তন ব্যথা-বেদনা-ক্ষোভ-আশা-আকাঙ্খার কথা। এই কবিতাগুলির রেশ ধরেই এসেছে (উপ)সংহার, – নিহত কন্যা ভ্রূণের জবানিতে চোখে জল আনা এই কবিতা পাঠকের অন্তরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দেয়।

'সুপারি গাছগুলো অবিচল একই ভাবে মেঘের সাথে গল্প করে যাচ্ছে' ... এদিকে বিষন্ন করবীর পাপড়ি ঝরে যায়, রাতের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে পরিত্যক্ত বসতবাটির একদা যত্নে লালিত গোলাপ, টগর, সন্ধ্যামালতীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে। এই কবিতার সঙ্গে ছবিটিও অনবদ্য, অনেকগুলি 'চলে যাওয়ার' ইঙ্গিতে এই কবিতাটি এক বিষাদের আবহ রচনা করে। 'দেশের বাড়ি' কবিতাটিতেও মাটির গন্ধ, কাশফুলের দৃশ্য বড় নস্টালজিক করে তোলে।

লালন, খেলাচ্ছলে আর আহ্বান কবিতায় ধরা পরে সমাজ দেশ কাল নিয়ে কবির সচেতনতা। আহ্বানের শেষ স্তবকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, মানবপ্রেম ছাড়া দিন বদলানো যায় না, এই অমোঘ সত্য ভুলে গেলে 'ভবিষ্যত'কে ঠিকানা হারিয়ে অন্ধ গলিতে ঘুরে বেড়াতে হবে ।

ছোট পরিসরেও কবিতার অন্য ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষার চেষ্টাটা ভালো লাগলো। যেমন, ডালিমকুমার কবিতাটিতে ছন্দবদ্ধভাবে একটি ছোট গল্প বলা হয়েছে। ডালিমকুমারের কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, চোখে জল এসে যায়। বোঝা যায়, কবি জীবনের নানা আলোছায়া খুবই সংবেদনশীলতা নিয়ে দেখেছেন, কিন্তু 'দুনিয়ার এই রঙ্গমঞ্চে, ইঁদুরদৌড়ের এই ব্যস্ত দুনিয়ায়' সেসব কথা ব্যক্ত করার মতো পরিসর পাননি, তাই হয়তো কখনো সূর্যমুখী, কখনো আকাশের তারা আবার কখনো বা চুপিসাড়ে বারান্দার রেলিং ঘেঁষে আসা চাঁদ হয়েছে তাঁর কথা বলার সঙ্গী ।

'দাম্পত্য একগুচ্ছ' ও 'কবি ও কবিতা'র চুড়ান্ত বাস্তবতার সঙ্গে অনেক পাঠকই একাত্মতা অনুভব করতে পারবেন।

সবশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, বইটির বিশেষত্ব হল, কবির বক্তব্যের আন্তরিকতা এভাবে পাঠককে স্পর্শ করে এবং আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে যে কাব্য ও ছবির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকতে মন চায়। আমি নিশ্চিত নই, এটাই হয়তো সাহিত্যের রসস্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায়।

মানস ঘোষ
কাগজের নৌকা

কাগজের নৌকাখানি ভাসিয়ে দিলেম নদীর জলে..
দেশ থেকে দেশান্তরে নদী যেন বয়েই চলে..

“উনিশ শেষের অস্তরাগে উঠল সেজে আকাশ
নতুন বছর আসছে বুঝি, বন্দরে তার আভাস”

শুভ নববর্ষ ২০২০